অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ঝিনুকের নৌকা
ঝিনুকের নৌকা ■ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্ম : ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ। ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার রাইনাদি গ্রামে। দেশভাগের পর ছিন্নমূল। যাযাবরের মতোই প্রায় কেটেছে যৌবন। কখনও নাবিক রূপে সারা পৃথিবী পর্যটন, কখনও ট্রাক-ক্লিনার। পরে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা। প্রধান শিক্ষকও ছিলেন একটি স্কুলে। আবারও ঠাঁই-বদল। কখনও কারখানার ম্যানেজার, কখনও প্রকাশন-সংস্থার উপদেষ্টা। শেষে সাংবাদিকতা।
প্রথম গল্প মফস্বল শহরের 'অবসর' পত্রিকায়। 'সমুদ্রমানুষ' লিখে পান মানিক-স্মৃতি-পুরস্কার। পরে শিশির পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার।
উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, অলৌকিক জলযান, মানুষের ঘরবাড়ি, আবাদ, নগ্ন ঈশ্বর, একটি জলের রেখা।

সুনেত্রা
ও
সতীনাথকে

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯০
প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য

ISBN 81-7066-983-9

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ২০·০০

ঝিনুকের নৌকা

এই লেখকের অন্য বই

অন্নভোগ

॥ এক ॥

চিঠিটা অফিসের ঠিকানায় দিয়েছে।

নিউজ ডেসকে একটা কাঠের বাক্স—তাতে সব চিঠি জমা হয়। যে যার মতো অফিসে এসেই একবার বাক্সটা দেখে। ইন্দ্রনাথ সাধারণত দেখে না। অফিসের ঠিকানায় তার নামে চিঠি আসে ঠিক। তবে বাণ্ডিল বাঁধা। সপ্তাহে দু-দিন মদন দুটো বাণ্ডিল দেয়। তার পাতা সংক্রান্ত সব চিঠি। ইদানীং সে রিপোর্টিং সেকসানে ফের বদলি হয়েছে।

একই হলঘরে টেলিপ্রিন্টার, নিউজ ডেসক, রিপোর্টিং সেকসান। চিফ রিপোর্টার, নিউজ এডিটারের ঘর আলাদা আছে—তবে হলঘরটাতেই বেশি সময় তাদের কাজ করতে হয়। এমন কি প্রুফ রিডারদের টেবিলও এক পাশে। স্পোর্টসের সুকান্তই চিঠিটি তাকে এনে দিয়েছে।

দেবার সময় বলেছে, ক'দিন থেকে দেখছি চিঠিটা পড়ে আছে।

ইন্দ্রনাথ এইমাত্র ফিরেছে। কৃষ্ণনগরে বাস দুর্ঘটনা। খবরটা ডাকে ধরাতে পারলে ভাল হয়। সে কিছুটা ব্যস্ত ছিল। মুখ না তুলেই বলল, রাখ।

সাধারণত অফিসের চিঠির প্রতি আগ্রহ থাকে না। তার আত্মীয়-স্বজন, কিংবা মা তার মেসের ঠিকানাতেই চিঠি দেয়। ছোট বোন কলকাতায় থাকে। দরকারে সে নিজেই মেসে চলে আসে। আর তার তেমন জরুরী চিঠি দেবার কেউ নেই। সব চিঠিই কোনো না কোনো অনুগ্রহ চেয়ে। সে একজন ঝানু রিপোর্টার—ভাবলে হাসি পায়। চিঠিতে এত বেশি স্তুতি থাকে! তখন তার মধ্যে কিছুটা তিক্ততারও সৃষ্টি হয়। তবে সব চিঠি সে খুঁটিয়ে পড়ে না। দু-এক লাইন পড়ে ফেলে দেয়। কোনো চিঠির শেষটা, আবার কোনো চিঠির সবটা। চিঠির গুরুত্ব বুঝে নিতে বেশি সময় লাগে না। চট করে ধরে ফেলতে পারে। মোটামুটি ডাকে ধরাবার মতো কপি শেষ করতেই দেখল অনন্ত চা রেখে গেছে। সকালে চিফ রিপোর্টারের ফোন, সে হাত মুখও ধোয়নি—তখনই ফোন, ইন্দ্র

শিগগির বের হয়ে যাও। সুখেনকে তুলে নিও। সে কোনোরকমে স্নানটান সেরে ডিম সেদ্ধ, দুটো আলু দু-পিস রুটি মুখে দিয়ে বের হয়ে গেছিল। সারাদিন কিছু আর খাওয়া হয়নি। ঘটনাস্থলেই এগার জনের মৃত্যু। ছোটাছুটির শেষ ছিল না। হাসপাতাল ডাক্তার, স্থানীয় লোকের মতামত, জীবিত বাস-যাত্রীদের কথা সব নোট করে আনতে হয়েছে। থানায়ও ছুটতে হয়েছে।

সে যে বেশ ক্লান্ত কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল।

সাধারণত এ-সব খবর জানার আগ্রহ সবারই থাকে।

পুরো একটা রিল ছবি তুলে এনেছে। প্রাথমিক ভাবে ছবিগুলির নিগেটিভ দেখে ঠিক করে দেবার দায়িত্ব তার। পরে নিউজ এডিটার পছন্দ মতো ছবি বেছে নেবেন। সে আলোতে রেখে নিগেটিভের রোল খুলে দেখছিল।

গাছে ধাক্কা—গাছটা উপড়ে পড়েছে।

তারপর খালের জলে বাস। উল্টে আছে।

একজন শিশুর মুখ।

না, দেখা যায় না!

অবশ্য স্পটে গিয়ে সে দেখেছে শুধু বাস। এবং কিছু স্থানীয় লোকজন। হাসপাতালে মানুষজনের ভিড়। মৃতদের সনাক্তকরণ——খবর পেয়ে কিছু আত্মীয়-স্বজনের ভিড় এবং লোক—সারাটা দিন তাকে মানুষের মৃত্যু হন্ট করেছে। এরা কেউ ভাবেনি মরে যাবে। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে আছে। হনিমুনে যাচ্ছিল। উত্তরবঙ্গের বাস।

এখন এই সব খবরগুলোর ডালপালা মেলে দিতে হবে। দুর্ঘটনার খবর মেন হচ্ছে। নিউজ এডিটার বলে দিয়েছেন, হিউম্যান স্টোরি বের করে নাও। ওটা আলাদা যাবে।

সে চা খেতে খেতে ভাবল, ডাকে যা হয় কোনোরকমে খবর ধরানো গেছে। আসলে একজন রিপোর্টারের দায় সাধারণ মানুষের কাছে এই খবর কতটা হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায়।

নিউজ এডিটার বললেন, যাক মেন নিয়ে চিন্তা নেই। যা আকাল চলছে খবরের। বাসটা দুর্ঘটনায় না পড়লে রাত দশটায় কি মেন হবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত থাকত না। সংবাদপত্রের এই রীতি। এখন এই খবর কী ভাবে ডিসপ্লে করা হবে তারই চিন্তাভাবনা চলছিল। কিছু খেলে ভাল হত। অনন্তকে ডেকে ইন্দ্র বলল, ক্যান্টিন থেকে যা পাস নিয়ে আয়। আগে কিছু মুখে দি। সুখেনকেও দিস। সে পার্স বের করে টাকা দেবার সময়ই দেখল চিঠিটা

টেবিলের পাশে পড়ে আছে। এক হাতে পার্স বের করে অন্য হাতে চিঠিটা তুলে দেখল। নামে চিঠি। তার পাতার দপ্তরের নামে নয়। চিঠিটা ব্যক্তিগত—হতেও পারে। আবার নাও পারে। নামের নিচে সিনিয়ার রিপোর্টার কেউ কেউ উল্লেখ করে। তাও নেই।

মা-র চিঠি ছাড়া তার এখন আর কোনো চিঠির প্রতিই আগ্রহ নেই। অবশ্য মেয়েদের চিঠি, কিছুটা প্রেমপত্রের গোছের মাঝে মাঝে পায়। সে বোঝে এও এক ঝকমারি। এরা আসে তার পাতায় লেখা বের করতে। গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা কম মেয়েদের মধ্যে আছে। দু-একজন অবশ্য দারুণ। তারা নিজেদের সম্পর্কে বেশি সচেতন। বরং তাদের লেখা ছেপে যেন ইন্দ্র নিজেই ধন্য হচ্ছে।

আসলে চিঠির বিষয়টা তার এখন মাথায় নেই।

টুকরো টুকরো ভাবনা কাজ করছিল।

ঠিক কি ভাবে আরম্ভ করবে—বুঝতে পারছে না। ডাকের জন্য খবরটা ধরানোই বড় কথা। কিন্তু মেন খবর, গদ্য ঝরঝরে না হলে লোকে পড়তে আরাম পায় না। সে কী ভেবে এক ফাঁকে চিঠিটা পকেটে ভরে ফেলল। সময়মতো দেখা যাবে। তার জরুরী কাজে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। চিঠি শত হলেও দূরের খবর দেয়। অন্তত কোনো কোনো চিঠি তার কাছে সে-ভাবেই আসে'।

কাজ সারতে রাত নটা বেজে গেল। এ-টেবিলে সে-টেবিলে কিছুক্ষণ বসল। মেসে ফিরে কিছুক্ষণ আড্ডা। আজ ফিরেই খেয়ে নিতে হবে। শীতাংশুর সঙ্গে যেতে পারে। গ্র্যান্ডে ভোজ পানীয় সব। সে শীতাংশুকে ডেকে বলল, আমাকে নিয়ে যাস।

রাতে সে বেশ মাতাল হয়েই ফিরল। পা টলছিল। সিঁড়িতে চাপা অন্ধকার। ইন্দ্র একটু বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলেছে। আসলে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি একসঙ্গে যুগলে মৃত্যু দৃশ্যটা সারাদিন হন্ট করেছে। বেচারাদের হনিমুন মাটি। ইন্দ্র টেবিলে বার বার বলছিল, এই নিয়তি। বোঝো—জীবনের কত বড়াই। হুঁ! ঘর বুক করা। খালি ঘরটার কথা ভাব। রাতে কী জমত মাইরি। তারপরই বলছিল, ফুটফুটে বাচ্চাটা—আহা পৃথিবীর কিছুই দেখল না। শীতাংশু দেখেছে, ইন্দ্র সাধারণত দুর্ঘটনার খবর কভার করতে চায় না। লোকজনের অভাব না থাকলে তাকে পাঠানো হয় না। আর এ-ধরনের খবর কভার করার পরই মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না ইন্দ্র। বলে, খুব বাজে। সারা রাত ঘুমাতে পারি না। ডেডবডিগুলি তাড়া করে। পেটে একটু পড়লে সব গুলিয়ে যায়। ফুলঝুড়ি

হয়ে সব ঝরে পড়ে। যেন কেউ আতস বাজির সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। কখনও নাকি দেখে নদীর জলে সে ভেসে যাচ্ছে। একটা কাক তার চোখ ঠুকরে খাচ্ছে। বিশ্রী সব স্বপ্ন সারারাত তাকে তাড়া করে।

ঘুম মানুষের বড় প্রিয়। ঘুমাতে পারবে না ভেবেই বেশি খেয়ে ফেলেছে। শীতাংশু তাকে ঘরে পৌঁছে জামা জুতো পর্যন্ত খুলে দিয়েছে। মশারি টানিয়ে রুম মেট রুপেনকে বলেছে, টেবিলে টাকা পয়সা থাকল। সকালে উঠলে বলে দেবেন। তারপর জামার মধ্যে একটা চিঠি। চিঠি বের করে বুঝল ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠি। সাদা খাম। খোলা হয়নি। জামার মধ্যে ফের চিঠি রেখে সে নেমে গেল।

সকাল বেলায় ইন্দ্রনাথের ঘুম ভাঙল দেরি করে। রুপেন অফিসে বের হয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথের হাই উঠছে। একটা ছায়া ভেসে গেল—কেউ উঁকি দিচ্ছে বার বার। সে উঠে বসল।

ভানু হাজির। সে ইন্দ্রনাথের মেজাজ জানে। দু-বার উঁকি দিয়ে গেছে। কিন্তু ডাকেনি। ইন্দ্রনাথ বুঝল, খুব ঘুমিয়েছে। শরীরে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। পাজামা পরনে। তাঁর যে হুঁস ছিল না টের পেতেই বলল, আমার জামা প্যান্ট!

ভানু বলল, নিচে।

তক্তপোষের নিচে সে উঁকি দিল। শীতাংশু নয় রুপেনের কাজ। পার্সটার খোঁজ করল, নেই। শীতাংশু কিংবা রুপেন কোথাও তুলে রেখেছে; সঙ্গে আর কিছু ছিল না। ডট পেনটা দেখল টেবিলে পড়ে আছে।

হঠাৎ মুখ তুলে বলল, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন! চা দে।

বাবু ধোবা এসছে। পাঠিয়ে দেব!

জামা প্যান্ট জমে গেছে বেশ। তক্তপোষের নিচ থেকে গতকালের জামা প্যান্টও টেনে বের করল। জামায় দাগ। ঝালঝোলের হবে। আর পরা যাবে না কেচে না এলে। তাও সে ধোবাকে বের করে দিল। বাবু কাগজের লোক সে জানে। পান টানের অভ্যাস আছে। জামা প্যান্টে নানা দাগ। পকেটে দশ বিশ টাকাও দু একবার পেয়েছে। ইন্দ্রনাথ সোজা বলে দিয়েছে, জামা প্যান্টের পকেট দেখে নিবি। রোজ রোজ বলতে পারব না। জামা প্যান্টে দরকারি কাগজ-টাগজও থাকতে পারে।

তখনই ইন্দ্র দেখল, পকটে থেকে একটা চিঠি বের করে সে তার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। দেখুন বাবু, কাজের তো।

চিঠিটার কথা তার মনেই ছিল না। চিঠিতে কি লেখা থাকবে, থাকতে পারে

তাও যেন জানা—ইন্দ্রনাথ, অনেকদিন দেখা নেই। বদলির দরখাস্ত করেছি। হচ্ছে না। কোন এক হেলথ সেন্টার থেকে কল্যাণ লিখেছে, তুই যদি চেষ্টা করিস হয়ে যায়। ব্যক্তিগত চিঠিগুলি সাধারণত এ রকমেরই হয়। হয়ে যাবেই। মন্ত্রী থেকে সরকারের বড় কর্তারা বেশ খাতির করে তাকে। সে জনসংযোগে বেশ মনযোগী। কল্যাণই তাকে একবার স্বাস্থ্য দপ্তরের গোপন দুর্নীতির খবর দিয়েছিল। খবরটা সরকারের উপরমহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল একসময়। সাধারণত পরিচিত অপরিচিতদের চিঠি এ-ভাবেই সে পায়। কারো ফ্ল্যাট, কারো বদলি, কারো চাকরির উমেদারির জন্য অনুরোধ থাকে।

এ-চিঠিটা তার ব্যতিক্রম সে অন্তত খোলার আগে বুঝতে পারেনি। দু-লাইনের চিঠি। ইন্দ্রদা, খুব বিপদ। পারো তো এস। একটা মফস্বল শহরের ঠিকানা। স্টেশন থেকে মিলের গেট বললে নামিয়ে দেবে। নাম ঠিকানা দিয়ে শেষ।

ইতি হিরণ।

হিরণ মানে লাবণ্যর বোন!

লাবণ্য! সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল! লাবণ্যর কোনো খবর দেয়নি। লাবণ্য তার গতজন্মের কেউ। সেই লাবণ্যর কোনো খবর নেই! অথচ হিরণ লিখেছে—খুব বিপদ।

লাবণ্যর সঙ্গে প্রথম দেখা স্টিমারঘাটে। শেষ দেখাও। লাবণ্য ফুলহাতা ফ্রক পরতে ভালবাসত। পায়ে কালো রঙের জুতো। সাদা মোজা পরতে পছন্দ করত। স্টিমারের আলোতে লাবণ্যকে ভিন্নগ্রহের বাসিন্দা মনে হয়েছিল। সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। নদীর জল কল কল। রাতের স্টিমার তার আলো, স্টিমার ঘাটের জেটিতে ছোট দাদু, সে। তার হাতে হারিকেন।

যুদ্ধ।

কলকতায় বোমা।

মানুষজন সব ভাগছে।

লাবণ্যরা এসেছিল অমলপুর থেকে।

অমলপুর কোথায় সে জানত না। কতদূর জানত না। তবু ছোট দাদু যখন বললেন, তোমার সোনামাসি মেসো আসছেন। লাবণ্য হিরণ আসছে। যুদ্ধ শেষ না হলে তারা ফিরতে পারবে না। স্টিমারঘাটে তাদের আনতে যেতে হবে।

যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ।

লাবণ্য হিরণ সোনামাসি—কত দূরের ছবি। প্রায় এক যুগের বেশি, ছিন্নভিন্ন

জীবনের কিছু ঝরাপাতা ওড়াউড়ি শুরু করে দিতেই কেউ যেন ডেকে গেল, ইন্দ্রদা যাবে !

হ্যাঁ যাব।

সে ভেবে পেল না কার সঙ্গে কথা বলছে ! কে এসে জানালায় দাঁড়াল। কে বলল, যাবে !

কোথায় যাবে !

হিরণের কাছে ! হিরণ আর দুটো বেশি কথা চিঠিতে লিখলে কী ক্ষতির ছিল। লাবণ্য আর কিশোরী নেই। সেও না। হিরণতো টের পেয়েছিল সব। হিরণ কেন লাবণ্যর কথা কিছুই লিখল না। গোপন এক অন্তরালে নানাবর্ণের ছবি, এবং হিরণ কি লাবণ্যকে এখনও হিংসা করে ! লাবণ্যরা কোথায় আছে ? সোনামাসি ! মেসোমশাই।

সে শহরটা চেনে। হিরণ সেখানে কি করে কিংবা তার বর ! কারো কোনো খবর দিল না। হিরণ কি একা ! লাবণ্য কী একা ! দাঙ্গা দেশভাগের পর কে কোথায় ছিটকে পড়ল! এত আত্মীয়-পরিজন, সবার খোঁজ রাখাও কঠিন। তবু সে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গেলে, সোনামাসির খোঁজ করত। সোনামাসি তার মার খুড়তুতো বোন। দাদুরা একান্নবর্তী—সে ছিল মামারবাড়িতে একজন আগন্তুকের মতো। মেজমামী তো মাকে বলেই দিয়েছিল, আমার এক ছেলে, বায়নার অন্ত নেই। আদর যত্নের ত্রুটি হলে যেন কথা না হয়।

মা বলেছিল, ইন্দ্র কোনো বায়না করবে না। না পারলে দুটো পান্তা দিও। তাই খেয়ে স্কুলে যাবে। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে—একটা টিনের বাক্স তার। ছোট দাদু নিজে গিয়ে ইন্দ্রকে নিয়ে এসেছিলেন। কান্নাকাটি করলে, ছোট দাদু বলেছিলেন, পদ্ম তুইও চল। কতদিন যাস না। ক'দিন থেকে আসবি। ছেলে-মানুষ, বাড়ির জন্য মন তো কেমন করবেই।

মা তার সঙ্গে এসেছিল।

বাবা তার শরিকি মামলায় নিঃশেষ। কিছুটা উদাসীন, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং ভাগ্যনির্ভর। তার পড়াশোনা বন্ধ করে দিতেই মা তাঁর ছোটকাকাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। পত্রে মা কী লিখেছিল সে জানে না।

হঠাৎ ইন্দ্র চিঠিটা আবার খুঁজল ! সে চুপচাপ বসেছিল। কেন যে মনে হল, হিরণ 'আমার' লিখেছে ! 'আমার বিপদ' লিখেছে, না 'আমাদের বিপদ'। আমাদের বিপদ লিখলে লাবণ্যকে যেন কাছাকাছি পাওয়া যাবে। 'আমার বিপদ' লিখলে তাও পাওয়া যাবে না। কোথায় চিঠিটা রাখল। ফ্যানের হাওয়ায়

কোথায় উড়ে গেল চিঠিটা, সে দেখল, না পাশেই পড়ে আছে।

সে চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়ল। আমার বিপদ, কিংবা আমাদের বিপদ না লিখে, লিখেছে খুব বিপদ।

কার।

হিরণের !

না লাবণ্যর।

কিংবা হিরণের অন্য কোনো নিকটজনের।

সে কিছুটা হতাশ হল।

আসলে সে কি হিরণের কাছে এখনও একজন আগন্তুক, কিংবা যেমন সেই শৈশব থেকে তার এই জীবনে উঠে আসার মধ্যেও একজন আগন্তুক ঘোরাফেরা করে। কেউ তার নিজের নয়। মনে হয় মা-ও না। সবাই যেন তাকে এই নির্বান্ধব শহরে একা ফেলে সরে গেছে। লাবণ্য চলে যাবার পর কতদিন চুপচাপ গিয়ে স্টিমারঘাটে বসে থাকত। ঝাউগাছের ছায়া, কিংবা নদীর ওপারে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ কোথাও দ্বীপের মতো কোনো ডাঙ্গার মানুষের ঘরবাড়ি তার চোখে পড়ত। লাবণ্যরা চলে যাবার পর এত অর্থহীন সবকিছু— যেখানে গেছে, নদীর চরায় কালীবাড়ির জঙ্গলে, কাছারি বাড়ির মাঠে সর্বত্র মনে হত লাবণ্য কোনো গাছের আড়াল থেকে কু করে উঠবে। সে কেবল ভাবত, লাবণ্য তার শেকড় আলগা করে দিয়ে চলে গেল। সে জোর পেত না। কিছু ভাল লাগত না। স্কুলের শেষ পরীক্ষার সময় দেশভাগ— আবার এক অশনিসংকেত। দেশবাড়ি ফেলে মানুষজনের মিছিল শুরু হয়ে গেল।

এ-দেশে এসে বাবা তবু থিতু হয়ে বসতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন গাছ লাগালে শেকড় আলগা থাকে না। তিনি ঘরবাড়ি বানালেন, গাছ লাগালেন। গাছের পরিচর্যা গৃহদেবতার পূজা-আর্চায় এবং সন্তান-সন্ততির বড় হয়ে ওঠার ভিতর শেকড় চালিয়ে দিতে পেরেছিলেন। বাড়িতে সে তখনও আগন্তুক। সে থাকলেও হয়, না থাকলেও হয়।

হিরণ চিঠিটা নিজের মানুষ ভেবে লিখলে সব খুলে লিখত। যেন যতটুকু প্রকাশ করা যায়, এমনকি কী বিপদ তাও তাকে ভাসাভাসাভাবে হয় তো বলবে। তার শেকড়বাকড়ের ভিতর ঢুকতে দেবে না।

শেকড় আলগা হলে মানুষের কী আর থাকে !

সে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু কাকে। তার তো অন্য কথা ছিল। ঘর-সংসার করলে শেকড় আলগা থাকে না। বাবা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে

হয়তো এমনই কথামৃত শোনাতেন।

এমন কি সে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেও থাকতে পারত। কিন্তু কোনো আগ্রহবোধ করে না। সে থাকবে না, ফ্ল্যাট বাড়ি শূন্য। কাজের লোক ধান্দায় থাকবে, যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরছে। আসলে তার জন্য কেউ অপেক্ষা করে না। সে যদি মেসে এক দু-দিন না ফেরে কেউ বলবে না, ইস কী না দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। খবর দিয়ে যাবে না! এভাবে কেউ যায়! কোথায় ছিলে!

এই অপেক্ষার জন্য সে মাঝে মাঝে কেমন উতলা হয়ে ওঠে। স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলে সে দেখত, লাবণ্য কাছারিবাড়ির মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকেই টের পেত, আজ তার কপালে আছে। লাবণ্য চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলে ফিরেছে বললে আরও ক্ষেপে যেত।— থাক খেলা নিয়ে। আমার সঙ্গে কথা বলবে না। মা কালীর দিব্যি। তারপর চোখ ফেটে জল বের হয়ে আসত।— কেউ তো নেই, কেউ তো বলে না, ইন্দ্রর ফিরতে এত দেরি হচ্ছে! সরকার বাড়িতে খবর পাঠাতে পারত। যেন না ফিরলেই আপদ দূর হয়। সরকার বাড়ির ছেলেরা ইন্দ্রর খবর দিতে পারে— একসঙ্গে স্কুলে যায়, ফেরে। দেড়ক্রোশ দূরে হাইস্কুল। শীতের সময় সাঁজ লেগে যেত ফিরতে। ফুটবল খেলে ফিরলে বেশ রাত হত।

এ-সময় মেসবাড়িটা খালি। ঘড়িতে দেখল বারোটা বাজে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। এক যুগেরও বেশি লাবণ্যরা তার জীবন থেকে সরে গেছে। তারা না সে। কে কোথায় ছিটকে পড়ল, লাবণ্যরা কিছুদিন শিলচরে ছিল। ছোটদাদুর কাছে সোনা মাসির চিঠি। শিলচরে বদলি হয়ে আসার পর সোনামাসি তাঁর ছোট কাকাকে খবর দিয়েছেন। লাবণ্য আর কত বড় হয়েছে, জানে না। লাবণ্য তাকে চিঠি দিতে পারত, দেয়নি। সেও চিঠি লেখেনি। ঐ বয়সে লাবণ্যর পক্ষে চিঠি লেখা অশোভন, সে লিখলেও। এমন কি লাবণ্য কেমন আছে, তার কথা কিছু লিখেছে কি না— তাও যেন অশোভনের পর্যায়ে পড়ে।

সে টের পায় মনটা খুব ভার হয়ে আছে।

সে উঠে পড়ল। তোয়ালে নিল। স্নানটান সেরে নেওয়া দরকার। বাইরে বের হয়ে ভাবল, চিঠিটা ঠিক জায়গায় রাখা দরকার। সে আবার ঘরে ঢুকে চিঠিটা জামার পকেটে ভরে রাখল। আবার কি মনে হল, চিঠিটা তোষকের তলায় রেখে দিল। তাকে হারাবার ভয়ে পেয়ে বসেছে। ভাগ্যিস ধোবার ছেলেটা বলেছিল, বাবু এটা কাজের তো! কাজের, কত কাজের, কত জরুরি সে যদি বিন্দুমাত্র তা জানত। তোষকের নিচে তার জরুরি সব চিঠি থাকে। কিন্তু কি

ভেবে আবার চিঠিটা ট্রাঙ্ক খুলে ভিতরে রেখে দিল। এতেও শান্তি পেল না। পকেট ডাইরিতে ঠিকানাটা নোট করে তবে শান্তি। ফোন টুকে রাখার নোটবুক। চাবি আর এই নোটবুক সে কখনও হারায় না। যতই মাতাল হয়ে ফিরুক, সব সময় পকেটে হাত রেখে মাঝে মাঝেই দেখত— বিদ্যুৎ চমকের মতো মগজের শিরা উপশিরায় এই দুটি বস্তু এত বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায় যে— সব হারালেও তারা ঠিকঠাক থেকে যায়।

সে স্নান সেরে ডাকল, ভানু।

সাড়া নেই।

ঘাড়ে গলায় পাউডার ছড়িয়ে ফের সিঁড়ির মুখে গিয়ে ডাকল, ভানু খাবার দিয়ে যা।

ঘরেই খাবার দেওয়া হয়। সকাল নটা থেকে মেসবাড়িটা গরম থাকে। তেতলার বোর্ডারদের ভানু, দোতলার বোর্ডারদের জগন। বাবু কাগজের লোক বলে বের হবার কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকে না। টাইমে ভাত না দিলেও চলে। টাইমে দিতে হলে ইন্দ্র আগেই বলে রাখে।

ভানু উঠে আসছে। তার থালা গ্লাস বাটি নিতে আসছে। ভানু জানে বাবুর থালা গ্লাস বাটি সম্পর্কে সুচিবাই আছে। নাম লেখা। পাল্টাপাল্টি হয় এই আশঙ্কায় বাবু থালা গ্লাস বাটিতে নাম খোদাই করে রেখেছে। বাবুটি খুবই মেজাজিমানুষ— টাকা পয়সা ধার চাইলে ফেরায় না। কখনও যেন ইচ্ছে করেই ভুলে যায়। সে দিতে গেলে, অবাক হয়। কবে নিয়েছিলি! ঠিক আছে। পরে দরকারমতো চেয়ে নেব।

এ-মেসে ইন্দ্র ভানুর কাছে বাবুর মতো বাবু। সেরা বাবু। ভানু জগন গুপি সে ঢুকলেই মেসে তটস্থ হয়ে থাকে। এক ডাকে তারা সাড়া দেবে। বাবুর ঘরে ছুটির দিনে কাগজের লোকেরা আসে। তখন বাইরে থেকে সে-ই খাবার এনে দেয়। আদা পেঁয়াজ কুচিয়ে দেয়। জগে জল রাখে। বাইরের টুলে বসে বসে ঝিমোয়।

ভানু!

যাই বাবু।

জল দিয়ে যা। জগে জল শেষ।

সিগারেট আন।

দশ টাকার নোট। বাড়তি পয়সা ফেরত দিলে, আরে নিয়ে যা। খুচরার কারবার আমার থাকে না।

এভাবে একজন বাবু বখশিস দিলে তাকে খুশি রাখতে কে না চায় ! মেজাজ প্রসন্ন থাকলে বাবু রেকর্ড চালিয়ে দেয় । হাতে তুড়ি বাজাবে । বাবুর পোষাকও একরকমের । কালো প্যান্ট সাদা শার্ট । শরীরে রঙের সঙ্গে ভারি মানিয়ে যায় । লম্বা সুদর্শন এই মানুষটির জুতো মোজা থেকে ঘরের আসবাবপত্র সবই বড় বেশি সৌখিনতার কথা বলে । কাজ-পাগলা মানুষ । বিপদেআপদে জান লড়িয়ে দেবে । বাবু না থাকলে জটাকে ফিরে যে পেতে হত না । হাত পা ফুলে ঢোল । দেশের বাড়ি থেকে বাবুর দয়াতেই হাসপাতালে এনে ভর্তি করাতে পেরেছিল। নেরফাইটিস ।

ইন্দ্র মাঝে মাঝে ওর মুখে নেরফাইটিস শুনলে হেসে ফেলত । আরে নেরফাইটিস নয়, নেফরাইটিস । কিডনির অসুখ । পেচ্ছাপের সঙ্গে রক্ত পড়ে বুঝলি ।

সেই বাবুটিকে আজ কেমন মনমরা লাগছে । চুপচাপ খাচ্ছিল । ভাল করে খেলও না । কেমন অন্যমনস্ক বাবু । হৈ চৈপ্রিয় মানুষ । আজ যেন তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না । সে খুব নিস্তেজ গলায় বলল, বাবুর শরীর খারাপ !

আরে না না ।

আপনি তো বাবু...

অঃ । ইন্দ্রর মনে হল সে ধরা পড়ে গেছে । সে তার ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা কাউকে বলতে পারে না । তার কোনো দুঃখ আছে, বিষাদ থাকতে পারে, শোকতাপ আছে এরা বিশ্বাসই করতে পারে না । খোসমেজাজে থাকলেই বলবে, ঘরে পরিবার নিয়ে আসুন বাবু । আরাম পাবেন ।

বাবা বেঁচে থাকতে বলতেন, গাছ লাগাতে শেখ । শেকড় আলগা হয়ে যাচ্ছে তোমার । গাছ লাগাতে শেখ বলতে বাবা তাকে কিছু বলতে চাইতেন । যেন বলার ইচ্ছে বিয়ে-থা করে সংসারি হও । বাবা সোজাসুজি কথা বলতেন না । ঘুরিয়ে বলতেন । কিছুতো তোমাকে রেখে যেতেই হবে । সবাই তোমার মতো হলে সৃষ্টির কী হবে বোঝো না ।

গাছ লাগায়নি ।

তার মনে হয় সত্যি একটা গাছ লাগাতে পারলে ভাল হয় । কিন্তু এই শহরে তুমি কোথায় । তার নিজস্ব জমি কোথায় । ফ্ল্যাটবাড়িতে টবে ফুলগাছ লাগাতে পারে । এতেও নাকি এক ধরনের শান্তি পাওয়া যায় । কেউ তোমার অপেক্ষায় না থাকলে বাকি জীবনটা কাশীবাস । বোঝো সেটা । লোটা কম্বল সার করে বের হয়ে যাও তবে । কাজে কামে কী দরকার !

সে কেন যে এতদিন এড়িয়ে গেছে । তার আয় মন্দ না । সে ইচ্ছে করলে ফ্ল্যাটবাড়ি নিতে পারে । সরকারি ফ্ল্যাট, ওনারসিপ ফ্ল্যাট, কতরকমের স্কিম । সামান্য ভাড়ায় সে ইচ্ছে করলে শহরের বুকেই জায়গা পেয়ে যেতে পারত ।

তারপরই মনে হয়েছে, অর্থহীন । বেশ আছে ।

আজ মনে হল, নিখোঁজের সন্ধান মিলেছে । অন্তত জানতে পারবে লাবণ্য কেমন আছে, কোথায় আছে । যদি লাবণ্য অপেক্ষা করে না থাকে, না থাকারই কথা । তবু যেন শেষ একটা আলোর বিন্দু তার জীবনে জ্বলে উঠেছে । লাবণ্য ভাল থাকলে সে ভাল থাকবে । লাবণ্য যেখানে যেভাবেই থাকুক— সে ভাল থাকবে ।

হিরণ লিখেছে, খুব বিপদ ।

সেটা কী হতে পারে । লাবণ্যর বিপদ, সোনামাসির । কিংবা তাদের প্রিয় কুকুর ছিল— ব্যাসিনজার । লাবণ্য বলত, ব্যাসিনজার খুব দর্লভ জাতের কুকুর । বাবার সঙ্গে অফিস যায়, বাবার সঙ্গে অফিস থেকে ফেরে । শিকারী কুকুর । ব্যাসিনজার না থাকলে তাদের বাংলো পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে যেত । তারা সবাই পুড়ে মরত । ইংরাজ আমল, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে লাবণ্যর বাবা ছিলেন টার্গেট । ইংরাজের বড় আমলা— জ্বালা থাকতেই পারে । সেই ব্যাসিনজারের ভয়ে তাদের বাংলোর সামনে কেউ ঘুরঘুর করতে পারত না । চোর চুরি করতে এলে একবার গলা কামড়ে ধরেছিল । ব্যাসিনজারের কোনো বংশধর কি এখনও তাদের পাহাড়া দেয় ! বিশেষ করে লাবণ্যকে ! কী যে আজেবাজে ভাবছে ! তবু কেন যে দীর্ঘদিন পর হিরণের চিঠি পেয়ে মনে হল, সত্যি একটা গাছ লাগানো বড় দরকার তার ।

॥ দুই ॥

ইন্দ্র পরদিন সকাল সকাল বের হয়ে পড়ল । হাতে এটাচি । স্টেশনে একটু আগেই চলে এসেছে । ট্রেন ফেল করার ভয়— এটা তার স্বভাব । যেখানেই যাক, মনে হয় ট্রেন ছেড়ে দেবে— তাছাড়া জ্যামে পড়ে যেতে পারে । সে হাতে সময় রেখে বের হয় । টিকিট কাউন্টারে ভিড় । সে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল । দু-পায়ের ফাঁকে এটাচি রেখে সিগারেট ধরাল ।

তার অফিসের ঠিকানা হিরণ জানতেই পারে । কিন্তু সে যে সেই ইন্দ্রনাথ জানল কী করে ! ওরা কেউ আসতে পারত । হিরণ এত জোরই বা পেল কী করে— খুব বিপদ । তুমি আসবে ।

আর তখনই কী হয়— সব ছবি ভাসতে থাকে।

তার মনে আছে, খুব সকালে ছোট দাদু তাকে সেদিন ডেকে তুলেছিলেন। রাঙ্গামামার সঙ্গে বাজারে পাঠিয়েছিলেন। বাড়িতে কিছুটা যেন উৎসবের মেজাজ। মামা মামীরা বেশ সন্ত্রস্ত ছিলেন। দু-দিন ধরে বাড়ির আগাছা-জঙ্গল সাফ করা হচ্ছে। বর্ষাকাল। তিন-চার বিঘে জমি নিয়ে বাড়িঘর। একদিকে ঠাকুর দেবতার জায়গা। চৌচালা টিনের ঘর পর পর। উঠোনে আমলকি গাছ, আতা বেড়া, পরে রান্নাবাড়ি— নিরামিষ আমিষ আলাদা। সেজ দিদিমা বড় দিদিমার এলাকা ভিন্ন। বাড়ির কৃতী জামাই আসছে— সোনা আসছে। তার দুই মেয়ে আসছে। মেসোমশাইর গল্প তার মা-র কাছেই শোনা। ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, তারপর পাক্কা সাহেব। পাইপ খান, হ্যাট-কোট পরেন। সোনামাসিকে দেখেনি। প্রায় দেবীর মতো নাকি মুখ চোখ— ডাকসাইটে সুন্দরী। মেসো তাদের রেখে চলে যাবেন। কলকাতায় বোমা পড়েছে, ইম্ফলের কাছে কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে— আজাদ হিন্দ ফৌজ এগিয়ে আসছে— বর্ষাকাল এবং খবরের কাগজ একমাত্র কবিরাজ বাড়িতে আসে। ছোটদাদু সাঁজ লাগলে লণ্ঠন হাতে কবিরাজ বাড়ি চলে যান। গাঁয়ের বয়স্ক মানুষেরা খবর শুনতে যায়। যুদ্ধের খবর। সে-ও দাদুর সঙ্গে একদিন গেছিল— যুদ্ধ সম্পর্কে সেভাবে ধারণা নেই। ক্লাশ সিক্সে পড়লে যুদ্ধ বিষয়টা মাথায় থাকে না— তার চেয়ে গাছপালা, রোদ, বৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ানো বেশি মজার। তবু গেছিল। ছোটদাদু বলেছিলেন, নেতাজীর ভাষণ দেবার কথা। পত্রিকায় বের হবে। অর্ধ সাপ্তাহিক কাগজ। তাও ডাকে আসে। সাঁজ বেলায় হাইজাদির ডাকঘর খোলা হয়। কারণ নৌকায় নাঙ্গলবন্দ থেকে ডাক আসতে সাঁজ লেগে যায়। ক্রোশ খানেক দূরে স্টিমার স্টেশন। সেখানেও স্টেশনমাস্টার কাগজ রাখেন। এত বড় তল্লাটে দুটো মাত্র কাগজ— আর কাগজের খবর শোনার জন্য গাঁয়ের মানুষজন ভেঙ্গে পড়ত।

নেতাজীর ভাষণ শোনা খুব জরুরি।

ছোটদাদু চাইতেন ইন্দ্র চোখ কান খোলা রেখে বড় হোক। মা-বাবা মরা ভাইজির বড় পুত্র ইন্দ্রকে সঙ্গে নেবার কেন যে তাগিদ ছিল এখনও সে ঠিক বুঝতে পারে না।

হ্যাজাক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কবিরাজ বাড়িতে যত সব রঙবেরঙের গাছ— তার ভিতর সবুজ লন। বিশাল ডিসপেনসারি । পাকা বারান্দা। কবিরাজ দাদুর লাল রঙের কোঠা বাড়ি। দাদু গেলেই ইজিচেয়ার পেতে দেওয়া হত। কবিরাজ দাদু আর একটা

ইজিচেয়ারে বসে আছেন। ভাঁজ করা কাগজ হাতলের উপর রাখা।

কাগজ পড়া শুরু হতে বিলম্ব হত।

যাদবকে দেখছি না।

আসছে।

রসময় এসেছে!

রসময় ভিড় থেকে হাত তুলে দেখাল এসেছে।

গাঁয়ের সবাই হাজির হলে কবিরাজ দাদু চশমার কাচ মুছে পড়তে শুরু করতেন। গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত মানুষেরা বারান্দার টুলে চেয়ারে ইজিচেয়ারে বসে। আর নিচে ঘাসের উপর সতরঞ্চ পাতা— নাপিত ধোপা সিং কিংবা কৈবর্ত সম্প্রদায়ের সব মানুষ এসে বসলে আবার হাঁক— সবাই হাজির!

যাদব পরামাণিক লণ্ঠন তুলে মুখ দেখে বলত, মনে হয় হাজির।

তারপরই ডেটলাইন থেকে পড়া শুরু। যুদ্ধের খবর শেষ হলে মোচ্ছব শেষে বাড়ি ফেরার মতো মানুষজন লণ্ঠন হাতে বাড়ি চলে যেত। পরদিন যুদ্ধ এবং আকাল সম্পর্কে কথা হত। কারণ চালের দাম হু হু করে বাড়ছে। সরকার সব চাল যুদ্ধের জন্য মজুদ করে রাখছে। যুদ্ধের বিভীষিকা এবং তার বর্ণনা শুনে মজা লাগত ইন্দ্রর। হের হিটলার ধ্বনি উঠত। গান্ধীজীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হিটলার আর্যজাতির প্রতিনিধি। আর্যরা হিন্দুকুশ পর্বতমালা পার হয়ে ভারতে ঢুকে গেছে— আর গেছে জার্মানিতে— ভারতকে আর ইংরাজদের পরাধীন থাকতে হবে না। বোঝো ঠ্যালা। শত্রুর শত্রু মিত্র। হিটলার বীর প্রতিভূ— এবং তার বাটারফ্লাই মোচ গাঁয়ে বেশ প্রভাব ফেলেছে। হরিশংকরবাবু লম্বা গোঁফ ছেটে ফেলে বাটারফ্লাই হয়ে গেলেন।

ফেরার সময় ছোট দাদু বলতেন, আর্যজাতির অপমান! এবার বোঝ ইংরাজ ব্যাটারা। দু'শ বছর ধরে শোষণ! সহ্য হয়। আর্য রক্ত বলতে কথা। হিটলার সহ্য করবে কেন। ধরণী কম্পমান। আর্যরক্ত শোষণ দেবতারাই বা সহ্য করবেন কেন! সে চুপচাপ শুনত।

বুঝলি ইন্দ্র, হিটলার সামান্য মুচির ছেলে। মানুষের জন্ম বড় নয়, কর্মই বড়। সুতপুত্র কর্ণের কথা বলতেন। জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক শ্রেয়। এবারে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

হিটলার যেন ভারতকে স্বাধীন করার জন্যই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। নেতাজীর অন্তর্ধান, ডুবো জাহাজে জাপান এ-সব খবরে তখন টান টান হয়ে থাকত গাঁয়ের মানুষজন।

গাঁয়ে ইন্দ্রের বয়সীরা মাঝেমাঝে খেলায় গোল দিলে, জয় দিত, হের হিটলার। ঝাঁক বেঁধে বোমারু বিমান উড়ে যেত কর্মিটোলার ঘাটির দিকে। তারা সবাই দল বেঁধে ছুটত। গুনত কটা বিমান। আটটা দশটা কুড়িটা। ছোট পাখির মতো দূর আকাশের নিচে ভেসে যেত। তারা মাঠের উপর দিয়ে ছুটত, যেন আর কিছুদূর গেলেই নাগাল পেয়ে যাবে।

রাঙ্গামামা বললেন, গগনা, মেজ জামাইবাবু আসছেন। ছোটকাকা তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।

সেদিন বাজারে এই খবরটা দিতেই রাঙ্গামামার সঙ্গে ইন্দ্র বাজারে গেছিল। বাড়ির মেজ-জামাই যে-সে মানুষ না। ইঞ্জিনিয়ার— বি-ই পাশ। ইংরাজের রাজ কর্মচারি। হিটলার ও গরিমা, মেজ-জামাইবাবুও পরিবারের গর্ব। ইন্দ্র বুঝতে পারত না, কে বড়, কে ছোট।

ছোট দাদু গগনা জেলেকে ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

সকালে কী মাছ সে দেবে। পাবদা। ইলিশ আর চাপিলা। এই তিনটে মাছ অমলপুরে পাওয়া যায় না। যা অমলপুরে পাওয়া যায় না, তা যে এখানে পাওয়া যায়— এবং খুবই তাজা মাছ— স্বাদই আলাদা। গোয়ালে গরু আছে, দুধ আছে, আরও দুধ চাই— নিরামিষ ঘরে নানা রকমের মিষ্টি, গাওয়া ঘি, এবং পাত-ক্ষীরেরও অর্ডার গেল আলিপুরার হাটে।

এত সব আয়োজন চলছে। ভিতর বাড়ির বড় টিন কাঠের ঘর সাফশোফ করা হচ্ছে। ঝুল ঝাড়া হচ্ছে। বড় খাট দুখানা। একটায় মাসিমা মেসো, অন্যটায় লাবণ্য হিরণ। বড় মেয়ে শৈলর বিয়ে হয়ে গেছে। সে-ও কৃতী পুরুষ। এস ডি ও। ঘরের একপাশে অর্ডার দিয়ে নতুন আলনা তৈরি করে দেওয়া হল। যেন কোনো অসুবিধা না হয়— এমনকি হ্যাট ঝুলিয়ে রাখার জন্য আলনায় হুকেরও বন্দোবস্ত রাখা হল।

বিয়ের দীর্ঘদিন পর মেসো এবার আসছেন। তাও দায়ে পড়ে। যুদ্ধ ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। গৌহাটিও নিরাপদ নয়। গৌহাটি থেকে পাক্কা চারদিন। কলকাতা থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ, স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ। সেখানে আবার স্টিমার বদল, ছোট স্টিমারে গোপালদির ঘাট। নদীর পাড় ধরে হেঁটে গেলে বেশি দূর না। নৌকায় গেলেও এক ক্রোশ। বর্ষাকাল— নৌকা ছাড়া গতি নেই। হরেন সারাদিন নৌকায় পড়ে থাকল। ছই মেরামত করল। কারুকাজ করা বেতের বাহারি ছই-এর নিচে কাঠের পাটাতন জুড়ে দেওয়া হল। তোষক, তার উপর সাদা চাদর, দুটো পাশবালিস পর্যন্ত রাখা হল। তিন জোড়া পাঁঠা আলিপুরার হাট

থেকে কিনে এনেছে সনৎ।

রাঙ্গামামার স্যান্ডো গেঞ্জি গায়। গাঁয়ে লাইব্রেরি করবে বলে একটা তালিকা তৈরি করেছে। মেসোর কাছে তালিকাটি দেওয়া হবে। তিনি শুধু বাড়ির কৃতী জামাই নন, অঞ্চলেরও। তাকে লাইব্রেরির জন্য একটা মোটা অঙ্কের টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করতে বলা হবে।

গৃহদেবতা লক্ষ্মী গোবিন্দ। থান আছে, সেবাইত আছে। থানেই পাঠা বলি হবে। শুনি মঙ্গলবার এবং অমাবস্যায়। মহাপ্রসাদের আয়োজনে রাম দাঁ ঠাকুরের আসনের নিচ থেকে টেনে বের করা হল। ইন্দ্র সকাল থেকেই দেখছে। লাবণ্য তার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। হিরণ আরও। তবু মনের মধ্যে খটকা এমন একজন কৃতী পুরুষের কন্যা লাবণ্য না জানি কেমন দেখতে! সে কথা বলতে পারবে কি না! কিংবা বড় মামীর মতো তাকে দূর দূর ছাই ছাই করে যদি। মামীর বড় মেয়ে মঞ্জু তার বয়সী। তার সঙ্গে মঞ্জুকে দেখলেই কেমন ক্ষেপে যায়— আবার তুমি ওর ঘরে গেছ। সেখানে কী মধু আছে তোমার শুনি!

সে দেখছিল স্বরাজ পাল পুকুরে নেমে যাচ্ছে। বালি মাটি দরকার। পুকুরের তলা থেকে বালিমাটি তুলছে। তুলে রোদে দিচ্ছে। তারপর বালি শুকিয়ে ঝরঝরে হলে কলাপাতায় তুলে নিয়ে গেছে। সুপারির পাটা বের করেছে দক্ষিণের ঘর থেকে। পাটায় বালি ফেলে রামদাঁয় ধার তুলছে।

তার আজ পড়ায় আগ্রহ নেই। লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। ছোটদাদুর এই আপ্তবাক্যটিও আজ শুনতে পায়নি। সকালবেলায় পড়াশোনায় অমনযোগী হলে দাদুর আপ্তবাক্যটি প্রতিদিন তাকে শুনতে হয়। তাঁর শাসন বলতে ঐটুকু। ভাইজিটির কপাল মন্দ। না হলে শৈশবে পিতৃহারা হয়! বিয়ে তো দিয়েছিল পালটি ঘরে। মন্দ কপাল না হলে শরিকী মামলায় সর্বস্বান্ত হতে হয়! তার বড় ছেলে ইন্দ্র। এই বয়সে মা বাবা ভাইবোন ছেড়ে এখানে অবহেলায় পড়ে আছে— তার উপর আর কি কটূ কথা প্রয়োগ করা যেতে পারে! শুধু ঐটুকু মনে করিয়ে দিলেই যেন যথেষ্ট। তাও তাকে ডেকে কিছু বলতেন না। ঘরের বাইরে গাছের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে কথাগুলি মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতেন।

সামান্য রাস্তা হেঁটে আসাও এত বড় আমলার পক্ষে যেন শোভন নয়। তা-ছাড়া বর্ষাকালে পূব বাংলার মানুষজনের নৌকাই সম্বল। সেই নৌকায় ছোট দাদুর সঙ্গে সে। দাদু কোথাও গেলে তাকে নেন। তা-ছাড়া কাজের লোক

হরেন তো থাকলই। সাঁজ লাগার আগেই ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে দেওয়া হল। লঞ্চের আলো, এবং ইস্টিশনের হ্যাজাক বাতি বড় তার প্রিয়। বিশেষ করে সাঁজবেলায় ইস্টিশন মেলার মতো জমে গেছে। চিনাবাদাম, ছোলা, মুড়ি মুড়কি কলা দই সব পাওয়া যায়। যাত্রীরা কেউ চিড়া দই মেখে খাচ্ছে। দূর দেশ থেকে আসা মানুষজনের শরীরে যেন আলাদা ঘ্রাণ। সে নদীর পাড়ে বেঞ্চিতে বসেছিল। স্টেশন মাস্টার খবর পেয়ে দাদুর সঙ্গে দেখা করে গেছেন। এটাও তার কাছে গর্ব। আসলে এ-যেন কোনো এক রহস্যময় দেশ থেকে স্টিমারটা লাবণ্যকে নিয়ে আসছে।

নদী থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে। কত নৌকা, কত কিসিমের নৌকা, একমাল্লা, দোমাল্লা তেমাল্লা, তালের নৌকা, আনারসের নৌকা, নদীর জলে শুশুক মাছ ভেসে উঠছে তলিয়ে যাচ্ছে। নদীর গভীর অতল জলে তারা সাঁতার কাটছে। ভিতরে তারও যেন গভীর গোপন অন্তরাল সৃষ্টি হচ্ছে। এটা আগে সে টের পায়নি। এমন কি মঞ্জু তার ঘরে ঢুকলেও না। মঞ্জুর বায়নাক্কা সামলাতে তার প্রাণান্ত। এক বছরেই সে টের পেয়েছে, যত আজগুবি কাজ তাকে দিয়ে করাতে চায়। পুকুরে ডুব দে। ডুব দিয়ে মাটি তুলে দেখা। সে সাত আট হাত জলের নিচ থেকে মাটি তুলে বাহাদুরি দেখাত। গাছের ডগায় লাল টকটকে আম। কে পারবে! মঞ্জু জানে ইন্দ্র পারতে পারে। সকালেই এসে জানালায় হাজির। ইন্দ্র যাবি—যানপাড়ের আমগাছে আম পেকে আছে। পেড়ে দিবি। সে পারে। সে পারে না, মঞ্জুর কাছে এমন কাজ থাকতে পারে না। না পারলে যেন সে ছোট হয়ে যাবে। পুকুড় পার হতে পারবি সাঁতরে! মঞ্জু পারে বসে থাকত। ইন্দ্র পুকুরের জলে ঝাপিয়ে দেখাত সে কত সাঁতারে পটু। তাকে নিয়ে মঞ্জুর এমন কত মজা ছিল। লাবণ্য কি তাকে নিয়ে মজা করবে।

মনে হল না লাবণ্য তা পারবে না। লাবণ্যর সে দাদা হয়। এবং সব নৌকায় লম্ফ জ্বলে উঠলে দেখল, দূরে স্টিমারের আলো। তার বুকটা সহসা তোলপাড় করে উঠল। স্টিমারে লাবণ্য আসছে। ডেকের রেলিঙে লাবণ্য দাঁড়িয়ে আছে। তার রেশমের মতো চুল উড়ছে নদীর হাওয়ায়। মেয়েটাকে দেখে কেন যে দূর থেকে মনে হল, লাবণ্য ছাড়া আর কেউ এ-ভাবে দাঁড়াতে পারে না।

স্টিমার ঘাটের দিকে আস্তে ভিড়ছে। ঝিক ঝিক শব্দ। নদীর জল আছড়ে পড়ছে। বড় বড় ঢেউ। নৌকা সব উথাল পাতাল। পাশের একটা জঙ্গলে স্টিমারের আলো পড়তেই হাজার হাজার পাখির ওড়াউড়ি শুরু হয়ে গেল। কক কক শব্দ। এবং এই তোলপাড় করা বনভূমির মধ্যে এত পাখি, সে একমুহূর্ত

আগেও টের পায়নি।

সে দেখল স্টিমার ঘাটে ভিড়েছে।

গেরাফি ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

লম্বা সিঁড়ি ধরে যাত্রীরা নামছে।

আর তখনই দেখল ছোট দাদু দ্রুত সিঁড়ির কাছে ছুটে যাচ্ছেন। সত্যি একজন ভিন্ন গ্রহের মানুষ নামছেন। সুট কোট টাই পরা, হাতে রুপোর স্টিক, পেছনে ফ্রক পরা মেয়েটা বাবার কোট ধরে আছে। পড়ে না যায়। খুবই ভীতু স্বভাবের। হ্যাজাকের আলোতে বোধহয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। ভাল করে তাকাতে পারছিল না। সাহেব-সুবো মানুষটির পেছনে মুখ লুকিয়ে রাখছে। পলকে দেখল বালিকা তার বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপরই কিছুটা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘাটের সিঁড়ি ভাঙছে। সোনামাসি স্টিমারেই আছেন। লটবহর, বড় বড় তিনটে কালো ট্রাংক সব নামিয়ে আনছে কুলিরা। সোনামাসি তদারক করছেন।

কি নামল, কি থাকল এ-সব দেখার দায় যেন সোনা মাসির। মেশো ঘাটে উঠে ছোট দাদুকে প্রণাম করল। সে দাদুর আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। বালিকাকে দেখেই মনে হয়েছিল এ-মেয়ে লাবণ্য না হয়ে যায় না। গায়ে ফুল হাতা ফ্রক। পায়ে সাদা মোজা। কালোরঙের জুতো চক চক করছে। চার পাঁচ দিন ধরে রেলে স্টিমারে গাড়িতে এতদূরে এসেও কোনো ক্লান্তি নেই। যেন এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে সাঁজ গোঁজ করে স্টিমার থেকে নেমে এসেছে। সে জানে না—স্টিমারে এত কি বন্দোবস্ত থাকতে পারে—চোখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ পর্যন্ত পড়েনি।

সোনামাসি উঠে এসে বলল, আমাদের টেলিগ্রাম তবে পেয়েছ! কী দুশ্চিন্তা—নৌকা না এলে কি হবে? সোনামাসি ছোটদাদুকে প্রণাম করলে ইন্দ্রর মনে হল সে খুব বোকামি করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি মেসোমশাই মাসিমাকে প্রণাম করতেই লাবণ্য তাকে দেখল।

ছোট দাদু বললেন, পদ্মর ছেলে ইন্দ্র।

সোনামাসি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। বললেন, তুই এত বড় হয়ে গেছিস। ইস আমরা যে তবে বুড়ো হয়ে গেলামরে!

সোনামাসির অকপট উষ্ণতায় ইন্দ্র কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। কুলিরা লটবহর উপরে টেনে আনছে। হরেনদা সব টেনে তুলছে নৌকায়। ওরা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সব তোলা হলে তারা উঠবে। হিরণ কেবল লাফাচ্ছিল। কত

বড় নদী। আর দু-পাড়ে গভীর জঙ্গল। নদীর চড়ায় ঘাস। সাঁজবেলার স্টিমার ঘাট। গ্যাস বাতি আর লোকজন, হৈচৈ। স্টিমার ছেড়ে দেওয়া, স্টিমারের ভো সব মিলে লাবণ্যকে কিছুটা বোধহয় স্তব্ধ করে রেখেছিল। সোনামাসি দাদুকে প্রণাম করতেই হুঁস ফিরে এল। লাবণ্য দাদুকে প্রণাম করে আবার তার বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই মাসি বলল, এ কি রে, ইন্দ্র তোর দাদা হয়, আমার ন'কাকার মেয়ে পদ্মদি। তার ছেলে, প্রণাম কর।

সেই যেন প্রথম গ্যাসের আলোতে লাবণ্য ইন্দ্রকে আবিষ্কার করল। হিরণ তার আগেই টুপ করে প্রণাম সেরে ফেলেছে। লাবণ্যর মনে দ্বিধা ছিল। কোনো সংকোচও থাকতে পারে। লাবণ্য তার বাবার পাশে। সে আর কি করে! কেন যে বলল, না না। আমাকে প্রণাম করতে হবে না।

যেন বেঁচে গেল লাবণ্য। সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাদের কবে নিয়ে যাবে বাবা?

লাবণ্য বোধহয় বাবা কাছে না থাকলে জোর পায় না। অথবা তার পিতৃদেবই সব। হিরণের কাছে মাসির গুরুত্ব বেশি লাবণ্যর কাছে তার বাবা। এমন অজ পাড়াগাঁয়ে তাদের রেখে তিনি চলে যাবেন, নদীর পাড়েই কষ্টটা বোধ হয় লাবণ্য টের পেয়েছিল। ছোটদাদু কিংবা সে তার সঙ্গ দিতে পারবে না, বুঝেছে। এমন যে মেয়ে, চুলে লাল রিবন বাধা, চোখ দেবীর মতো টানা টানা, গায়ে ফুল হাতা সিলকের কারুকাজ করা ফ্রক—বাতাসে উড়ছে। বাতাসে ফ্রক উড়ে কখনও জানুর উপর উঠে যাচ্ছে। সে টেনে টুনে ফ্রক সামলাচ্ছে—তার যেন আর কিছু করণীয় নেই।

মেসোর মুখ কিছুটা বিমর্ষ। তার আত্মজনদের এতদূরে ফেলে রেখে গিয়ে তিনি খুব একটা ভাল থাকবেন না। অন্তত তাঁর কথাবার্তা শুনে ইন্দ্রর এমনই মনে হয়েছিল, তিনি কিছুটা অস্বস্তিতে আছেন—বললেন, দেখি। যুদ্ধ শেষ হলেই তোমাদের নিয়ে যেতে পারব। দেখি কি হয়! এর চেয়ে বেশি আর কি তিনি আশ্বাস দিতে পারেন। লাবণ্যর গোমড়া মুখ দেখে ইন্দ্রর খুব খারাপ লাগছিল। মেয়েটা যেন জলে পড়ে গেছে।

দাদু বললেন, যাও এবার গিয়ে উঠে পড়।

দাদুর চুল সাদা। হাঁটুর নিচে ধুতি। পায়ে কেডস। তার পায়েও। বাড়িতে চামড়ার জুতো পরা নিষিদ্ধ। ঠাকুরের বাড়ি। বাড়িতে বিগ্রহ আছে। ঘরে চামড়ার জুতো পরে কেউ ঢোকে না। এমন কি ইন্দ্র স্কুলে যায় খালি পায়ে। কোনো অনুষ্ঠানে গেলে জুতো পরে। বাড়ি যাবার সময়ও সে জুতো পরে না।

এই অজ পাড়া গাঁয়ে জুতো পরার বিশেষ চল নেই। সেখানে লাবণ্যর পায়ে চামরার জুতো। বাড়িতে সে দেখেনি, মেয়েরা কখনও জুতো পড়েছে। লাবণ্য শুধু জুতো নয়, মোজাও পরেছে। হিরণও তাই। মাসি বোধহয় বাড়ির হাল চাল জানে—পায়ে রবারের চটি। আর মেসোর তো বকলেস পরা জুতো, মোজা।

স্টেশনে আর যারা নেমেছিল, সবাই একবার তাদের বিস্ময়ের চোখে দেখেছে। দেখতেই পারে। চোখ ফেরানো যায় না। মনমোহন কর্তার জামাই মেয়ে। এক পলকেই যেন সবাই টের পেয়ে গেছে। কেউ কেউ দাদুকে এসে প্রশ্নও করেছে, সোনা না? সোনার বর না। আসলে এলাকায় এই পরিবারটি যে খুব সম্ভ্রান্ত তারা জানে। তাদের বাড়ির জামাই যেন এমনই হওয়া উচিত। তালুক আছে, আয় আছে, মেয়েরা শহরে থেকে কেউ পড়াশোনাও করছে। এমন বাড়িতে লাবণ্য, হিরণ খুব একটা বেমানান নয়।

কিন্তু লাবণ্য জোর পাচ্ছিল না।

সবাই নেমে যাচ্ছে নৌকায় ওঠার জন্য। লাবণ্য নড়ছে না। সবাই উঠলে, ইন্দ্র উঠবে। ছোট দাদু উঠবে।

লাবণ্যকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইন্দ্র বলল, লাবণ্য দাঁড়িয়ে থাকলি কেন। যা উঠে পড়।

লাবণ্য বলল, পড়ে যাব না তো। কাদা।

তা ঠিক, নৌকায় উঠতে গেলে কাদা লেগে যেতে পারে। জলে ভাটার টান ধরেছে। তবু সে জানে কোথাও আছে পলিমাটি তার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে জুতোয় কাদা নাও লাগতে পারে। সে এই ইস্টিশনে দিনের বেলা অনেকবার হেঁটে চলে এসেছে। নদীর পাড়ে পাড়ে আসা যায়। ঝাউ গাছগুলি সড়কের দু-পাশে শন শন হাওয়া দেয়। নদীর পাড় বাঁধানো এদিকটায়। জলে টান না থাকলে ঘাট ধরেই নেমে যাওয়া যেত।

ইন্দ্র বলল, আমার হাত ধর। দেখ পা পিছলে পড়ে যাস না। এদিক দিয়ে আয়।

লাবণ্য বলল, ইন্দ্রদা হাত ধর। বলেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত। কিন্তু নৌকা পর্যন্ত হেঁটে যেতে যেতে ইন্দ্র টের পেল, নরম হাত বরফের নয়—ধীরে ধীরে যেন উষ্ণতার জন্ম হচ্ছে। লাবণ্য সহজেই লাফিয়ে নৌকায় উঠে গেল।

তারপর নৌকা ছেড়ে দিলে, পাল তুলে দিলে লাবণ্য ছই-এর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। ইন্দ্র ছই এর বাইরে। ছোটদাদু গলুইয়ে। হিরণও ভিতরে থাকল না।

সেও লাফিয়ে সামনের দিকে চলে এল। বর্ষাকাল বলে নদীর দু-পাড় দেখা যায় না। মাঝ গাঙে নাও—পাল তুলে দিলে শাঁ শাঁ করে নৌকা ছুটতে থাকল। জ্যোৎস্না উঠেছে।

নৌকা দুলছিল ঢেউয়ে।

কাত হয়ে যাচ্ছিল।

লাবণ্য পড়ে যেতে যেতে ইন্দ্রকে জাপটে ধরল। তারা তো জীবনে স্টিমারে ওঠে নি, নৌকায় ওঠেনি। অভ্যাস নেই। স্টিমারে নাকি লাবণ্যর গা বমি গা বমি ভাব ছিল।

ইন্দ্র বলল, স্টিমারে আমিও উঠিনি।

হিরণ বলল, জান স্টিমারে না দিদি বমি করেছে।

যা! বলে লাবণ্য হিরনের গা ঠেলে দিল।

তুই খুব ভীতু লাবণ্য। ইন্দ্র বলল।

না মোটেই না।

সে হঠাৎ দেখল মেশো তাদের দিকে চলে এসেছেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পকেট থেকে লম্বা একটা কি বের করলেন। ইন্দ্র, লাবণ্য এবং হিরনকে বলল, এই তোরা পেছনে গিয়ে দাঁড়া।

ইন্দ্র বুঝতে পারল, অনেকক্ষণ নেশা করতে পারেনি মেসো। ছোট দাদু নৌকায়, নেশা করা যায় না। ছোট দাদু স্টেশনে নেশা করার সুযোগ পায়নি। পাইপ খুঁচিয়ে কী ফেলে দিল জলে, আবার কি ভরল। ছোট দাদুও ছই-এর আড়ালে আছেন। বোধ হয় মাসিকেও বলে এসেছেন, বুড়োকে সামলিও। মাসি তার কাকার সঙ্গে জোর গল্প জুড়ে দিয়েছে। কে কোথায় আছে, কেমন আছে, বড় বৌ কলকাতা থেকে কবে এল, ছোট পিসির ছেলেরা কে কোথায়, পদ্মদি কবে এসেছিল কটি তার সন্তান। বড় বাবু আসেন কিনা। ইন্দ্রর বাবাকে সোনামাসি শুধু না সবাই এমন কি গাঁয়ের লোকজনও বড়বাবু কেন বলে জানে না। ইন্দ্রর ঠাকুরদা এককালে রৌরব নামে একটা ঘোড়া পুষত। মেলায় বাজিতে ঘোড় দৌড় হত। বড়বাবুর ঘোড়া। বাবাই নাকি ছিল সহিস ঘোড় দৌড়ে। অনেক কাপ মেডেল ঘরে আজও আছে। সেই বাবা তার কেমন হয়ে গেল। কোথাও যান না। বাড়ি ছাড়া নড়েন না। ছোট দাদু মেলার ঘোড়দৌড়ে বাবার সবিশেষ পটুত্বেই নাকি মজে গিয়েছিলেন। এ-ছেলেকে বাড়ির জামাই না করতে পারলে বংশগৌরব রক্ষা হবে না।

ইন্দ্র তার মায়ের মুখ পেয়েছে। গঠন পেয়েছে বাবার। এই বয়সেই সে বেশ

লম্বা চওড়া হয়ে গেছে। দাদু বলতেন, বাতাসে বাড়ছে ছোড়া। বয়সে না। সে লাবণ্যর চেয়ে লম্বা। মেয়েরা এক বয়সে ছেলেদের চেয়ে বেশি লম্বা হয়ে যায়। লাবণ্য তার বাবার মুখ পেয়েছে। লম্বাটে মুখ। বাঁশ পাতার মতো নাক। থুতনি পাকা আমের মতো মসৃণ। গাল আপেলের মতো রক্তিম। এবং চোখে বেথুন ফলের সতেজ দৃষ্টি। হিরণ, মাসির মতো। ইন্দ্র স্টেশনে দেখেছে, ছই এর নিচে হারিক্যানের আলোয় দেখেছে আর আশ্চর্য লাবণ্য আসায় সে যেন আর বাড়ির কথা বেশি ভাবতে পারছে না। লাবণ্যর কোনো অহঙ্কার নেই। বড়মামীর মতো মঞ্জুকে নিয়ে ঠেস দেওয়া কথাও যেন শুনতে হবে না। কারণ লাবণ্যতো সহজেই বাইরে এসে তার পাশে ছই-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কী মজা কে জানে, লাবণ্য যে তাকে অপছন্দ করবে না তাতেই তার গর্ব।

নৌকা যাচ্ছে।

হিরণ বলল, কেবল জল। ইস কত নদী নালা। ঐ দেখ ও ইন্দ্রদা, ওটা কি গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে!

জ্যোৎস্নায় দূরের ছবি স্পষ্ট নয়।

ওটা হাড়ি পাতিলের নৌকা কি করে বুঝবে হিরণ!

লাবণ্য বলল, কোনটারে?

দেখছিস না, ঐ যে ওদিকটায়। বিশাল একটা মাটির ঢিবি মনে হয়! নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে।

আসলে হাড়ি পাতিলের নৌকায় লণ্ঠন জ্বলে ভেতরে। রাতে বাইরে থেকে বোঝার উপায় থাকে না, হাড়ি পাতিলের নৌকা। হাড়িপাতিল বোঝাই নৌকা জ্যোৎস্না রাতে মাটির ঢিবির মতো লাগে দূর থেকে দেখতে। লাবণ্য হিরণ কি করে জানবে!

ইন্দ্র এখন কিছুটা তাদের কাছে বিজ্ঞজনের ভূমিকা নিয়ে ফেলল, বলল, ওটা হাড়ি পাতিলের নৌকা, অমলপুরেও দেখা যায় না।

ওটা?

আনারসের নৌকা।

পাশ দিয়ে একটা নৌকা কুমীরের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে।

কী করে বুঝলে!

আনারসের গন্ধ পাচ্ছিস না?

দুজনেই নাক টানল।

লাবণ্যর বিমর্ষভাবটা কেটে গেছে।

লাবণ্য বলল, ইন্দ্রদা নদীতে কুমীর আছে ?
হ্যাঁ আছে। নদীতে কুমীরতো থাকবেই।
তুমি দেখেছ !
ইন্দ্র হ্যাঁ বলে দিল।
আর সঙ্গে সঙ্গে টুপ করে ডুবে গেল লাবণ্য। ছই-এর ভিতর ঢুকে গেল। সে হেসে দিল।
কিরে তুই ! ইন্দ্র চায় না লাবণ্য ছই নদী, জ্যোৎস্না, জলের অবিরাম কল কল শব্দ কিংবা পাড়ের ছবি দেখা থেকে বঞ্চিত হোক। কিছু পাখি উড়ে গেল ঝাঁক বেধে। হিরণ বলল, রাতে কুমীর দেখা যায় ?
ইন্দ্র বলল, দেখা যাবে না কেন ! কুমীর নদীর চড়ায় ডিম পাড়ে জানিস !
বাবাঃ, বলছ কি ! নদীতে ডিম পাড়তে দেখেছ ?
ইন্দ্র এবারেও হ্যাঁ বলে দিল।
এদিকে লাবণ্য ছইএর ভিতরে ঢুকে গণ্ডলোগ পাকিয়ে বসে আছে। মাকে বলছে, আমি বাবার সঙ্গে চলে যাব। জান নদীতে না কুমীর আছে। ইন্দ্রদা দেখেছে।
সোনামাসি বলল, এই ইন্দ্র ভয় দেখাচ্ছিস কেন ! নদীতে কবে তুই কুমীর দেখলি ?
হিরণও টুপ করে ছইএর মধ্যে ঢুকে গেল।
চরে ডিম পাড়ে। ইন্দ্রদা দেখেছে।
তোমাদের ইন্দ্রদা যে কত কিছু দেখে। আমরা তো শুনিনি নদীতে কুমীর আছে।
দাদু বললেন, তোরা না অমলপুরে থাকিস।
থাকিইতো।
এটা ইছাপুর। অমলপুরে যা আছে এখানে তা পাবি না। ইছাপুরে যা আছে অমলপুরে পাবি না। অমলপুরে এত বড় নদী আছে !
সত্যি নেই। দুবোনই চুপ।
অমলপুরে নৌকায় উঠে কোথাও গেছিস !
একদম উঠি নি।
ইছাপুরে আসতে হলে স্টিমারে উঠতে হয় ! অমলপুরে স্টিমার আছে ?
না তাও নেই।
দাদু হেসে দিলেন। এ ক'দিন ইন্দ্র কেবল বলছে, অমলপুরে কি আছে ?

অমলপুরে যা আছে আর কোথাও তা থাকতে পারে না। এখন ইছাপুরে যা আছে অমলপুরে তা পাওয়া যায় না। ইন্দ্র তোদের ক্ষেপাচ্ছে। তোরা বুঝলি না, ইন্দ্র ইছাপুরে থাকে। ইছাপুর অমলপুরের চেয়ে কম যায় না।
হঠাৎ লাবণ্য ছইএর বাইরে এসে ইন্দ্রকে ঝাঁকিয়ে দিল।
তুমি মিছে কথা বললে কেন ?
কোথায় মিছে কথা বললাম।
নদীতে কুমীর নেই।
কে বলেছে নেই !
মা বলল, ছোট দাদুমণি বলল।
ওরা কিচ্ছু জানে না। থাকছিস তো, দেখতেই পাবি। কিন্তু মুসকিল বাড়ি থেকে নদীর পাড়ে হেঁটেই আসতে পারবি না।
কেন !
দূর না। অতটা রাস্তা কখনও হেঁটেছিস। আমি তো দৌড়ে নদীর পাড়ে চলে আসি। এক ক্রোশ পথ। সোজা না।
আমরাও পারব।
বিশকাটালির জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারবি ?
হ্যাঁ পারব।
তা হলে তো হয়েই গেল। কুমীর দেখা তোদের কপালে আছে।
আসলে নৌকাতেই দুই বোন ইন্দ্র যে খুবই দুঃসাহসী টের পেয়ে গেল। নদীর জলে কুমীর থাকতেই পারে। তারা ভয় পাবে বলে মা ইন্দ্রদাকে ধমকে বলেছে, তুই কত কিছু যে দেখিস। মার কথা তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। ছোট দাদুর কথাও না। হরেন কাকা এখন নৌকা খালে ঢুকিয়ে দিতে ব্যস্ত। খালটা ইছাপুর গাঁয়ে মনমোহন কর্তার বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে। অন্ধকার গাছপালার মধ্যে বর্ষার জল থৈ থৈ করছে। জোনাকি উড়ছে বাতাসে। শাপলা শালুকের ফুল ফুটে আছে, এবং ভাদ্রমাস বলে জলে জলজ ঘাসের পচা গন্ধ। ইন্দ্রই সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। ওটা গাব গাছ। ওটা তারিণী চন্দের বাড়ি। ও দিকটায় গাঁয়ের কাছারি বাড়ি। কেবল চুপ ছিলেন লাবণ্যর বাবা। তিনি এই জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে মুখে কিছুটা দুশ্চিন্তা। স্ত্রী এবং দুই বালিকা কন্যাকে এতদূর রেখে যাবেন ভেবেই হয়তো মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি একটা কথাও বলছেন না।

॥ তিন ॥

ইন্দ্র পকেট হাতড়াল।

চিঠিটা ঠিক আছে তো!

চিঠিটা পাওয়ার পর সে কেমন ঘোরে পড়ে গেছে।

চিঠি দূরের খবর দেয়। কিন্তু এ-যেন এক অসীম যোজন অন্ধকার পার হয়ে কোনো এক অলৌকিক খবর বয়ে এনেছে। দুঃসংবাদ, সুসংবাদের চেয়েও বড়, দীর্ঘদিন পর সে জানতে পারবে লাবণ্য কোথায় আছে, কেমন আছে। দেশ ভাগের বছরই তারা চলে এসেছিল। স্কুলের শেষ পরীক্ষার পর। সে অফসান দিয়ে এদেশের পরীক্ষার্থী। বাবা জমি জায়গা ঘর বাড়ি বেঁচে রেলের ধারে বাড়ি করেছিলেন, ঠিক রেলের ধারেও বলা যায় না স্টেশন থেকে নেমে কিছুটা পাকাসড়ক, কিছুটা কাচা সড়ক পার হয়ে এক উরাট বনভূমিতে ঘরবাড়ি বানিয়েছেন। পরীক্ষার পর কে কোথায় এসে উঠেছে, খোঁজখবর। কারণ এতদিনে লাবণ্যরা যে আত্মীয়স্বজনের কাছে সম্পর্কহীন হয়ে গেছে সে জানবে কী করে।

গুপ্তিপাড়ায় ছোটমামা এসে উঠেছেন।

সে পরীক্ষার পর গুপ্তিপাড়া গিয়েছিল।

বাবা বলেছিলেন, একা যেতে পারবে তো। তোমাকে কাটোয়া হয়ে বর্ধমান যেতে হবে। ছোট রেলেও যেতে পার। কালনায় নেমে বাস পাবে। একা যেতে পারবে তো!

সেই শুরু। অন্বেষণ।

ছোটমামা খুবই ক্ষুব্ধ। মামীও।

আর বলিস না। দিদি কোনো চিঠির জবাব দেয় না। ওরা তো শিলচর আছে। কী জানি ঘাড়ে গিয়ে পড়ি—না খেয়ে থাকলেও হাত পাতব না।

দেশ ভাগ কত মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়েছে।

ছোটমামার অভিযোগ শুনে মনে হয়েছিল, সত্যি সোনামাসি স্বার্থপর।

পরে কে যেন বলেছিল, ওরা লামডিংয়ে আছে।

লামডিং কোথায় সে জানে না। মণিপুর যেতে হয়তো লামডিং পড়ে। বড় হয়ে তার বাসনা ছিল লামডিং যাবে। কেউ খবর দিয়েছিল ওরা গৌহাটিতে জ্যাঠার বাড়িতে আছে। কিন্তু কোনো সঠিক খবর কিংবা সে ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারেনি। শুধু সে জানে, লাবণ্য চলে যাবার আগে নারী হয়ে গেছে। সে

পুরুষ। আশ্চর্য এক উষ্ণতার জন্ম দিয়েছিল লাবণ্য। এমন মিষ্টি সুন্দর মুখ, এবং গভীর আকাঙ্ক্ষা কিংবা স্বপ্ন সব ছবি হয়ে থাকলে লাবণ্যর জন্য সে তো অস্থির হয়ে থাকতেই পারে।

বছর দুই পড়াশুনা বন্ধ ছিল। বাবা নিরুপায় তখন। ছোটদাদু খবর পেয়েই ছুটেছিলেন। এত অমানুষ তুমি! ছেলেটার পড়া বন্ধ করে দিলে। আমরা কী মরে গেছি! দাদুর সেই তড়পানিতে বাবা মাথা গোঁজ করে বসেছিলেন। রা নেই। তাঁর ছেলে কারো গলগ্রহ হবে,করুণা-প্রার্থী হবে বাবার ধাতে ছিল না। তবু মা-র জোরাজুরিতেই বাবা যেন রাজি হয়ে গেলেন। ছোটদাদু সারা রাস্তায় গজ গজ করেছেন। ইস্ দুটো বছর সোজা কথা!

গাড়িটা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কু শব্দ করছে। স্টেশন পড়ছে, থামছে লোকজন উঠছে। সে বসে আছে চুপচাপ। জানালায় মুখ। গ্রাম মাঠ ফসলের ক্ষেত পার হয়ে গঞ্জ মতো জায়গা পার হয়ে ট্রেনটা ছুটছে। যেন সে চায় না, ট্রেনটা আর কোথাও থামুক। তাকে এই রেলগাড়ি যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছে দিক। থামলেই অস্থিরতা বাড়ে। সে সিগারেট খায়। চা খায়। চারপাশে মানুষজনের ভিড়। কোলাহল। খবরের কাগজ কারো হাতে। কেউ ব্যাগ পায়ের কাছে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বচসা, জায়গা নিয়ে মারামারি। ঠেলাঠেলি। গাড়িটাতে এত মানুষজন আছে—এত খবর আছে, সে তো এই ট্রেন যাত্রা নিয়েও স্টোরি করেছে কাগজে। নিখুঁত বর্ণনা, মানুষের রেল যাত্রায় অসংখ্য অসুবিধার কথা তুলে ধরেছে। ফ্যান চুরি গদি চুরি। ইলেকট্রিকের তার চুরি। কত কিছু তখন তার নজরে পড়ত। এখন সেই কিশোরীর মুখ ছাড়া তার চোখে কিছু ভাসছে না।

সে হুবহু মনে করতে পারছে সব।

লাবণ্যর সঙ্গে তার প্রথমদিনের বোঝাপড়ার কোনো হেরফের হয়নি। অথচ চিঠিটা পাবার পর শুধু লাবণ্য, শুধু এক বালিকা এখন এই ট্রেনের ভিতর একা বসে থেকে টের পেল, নিখুঁত সব নিসর্গ এবং বালিকার কিছুটা চাপা স্বভাব, কিছুটা তরলমতি, আবার কিছুটা গম্ভীর—কখনও অত্যন্ত অস্বাভাবিক। সে যা ভাবতে পারত না, যা তার মাথায় আসত না, লাবণ্যর মাথায় আসত।

ইন্দ্রদা---আ।

কে ডাকছে!

সে পেছন ফিরে তাকাল। বাড়ি থেকে নেমে ছাড়াবাড়ি, তারপর কবিরাজ বাড়ি, বিশাল অর্জুন গাছের ছায়া পার হয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল। মাঠে গিয়ে পড়লে

গাঁয়ের সব অন্য পড়ুয়াদের দেখতে পাবে। একসঙ্গে স্কুলে যায় দল বেঁধে; ফেরে দল বেঁধে। কে ডাকছে!

অ মা! লাবণ্য কবিরাজ বাড়ির চন্দন গোটার জঙ্গলে এক আশ্চর্য অপ্সরা যেন। সে ইশারায় ডাকছে।

তুই!

এই নাও। শিগগির ধর।

সে অবাক হয়ে গেছে। কী ধরতে বলছে!

ইস বলছি হাত পাত।

জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। একটা খাল মতো জায়গার পাড়ে চন্দন গোটার জঙ্গল। পেছনে কবিরাজ বাড়ির অন্দরের পুকুর। গাছপালায় ভর্তি কিছুটা বনভূমির মতো।যেন বনদেবী দাঁড়িয়ে তাকে হাতে কিছু দিতে চায়। ঘাড় পর্যন্ত চুল। পাতলা সাটিনের ফ্রক। পায়ে স্লিপার। খালি পা দেবীর। মোজা পরা নেই। জানুর নিচে সাদা বন আলুর মতো বাহার।

সে কথা বলতে পারছে না। এতদূর একা চলে এসেছে লাবণ্য। কি দিতে চায়!

হাত পাতছ না কেন?

লাবণ্য নিজেই যেন এতদূর এসে ত্রাসে পড়ে গেছে। সে লক্ষ্য রাখছে কেউ দেখে ফেলল কি না আবার! এদিক ওদিক ইতস্তত তার দৃষ্টি। চোখে মুখে কোনো অপরাধ বোধও কাজ করছে।

সে বলল, তুই কিরে! বাড়িতে বলতে পারলি না।

পাত না হাত! প্লিজ।

সে হাত পাতলে দেখল, টুক করে দু আনা পয়সা তার হাতে দিয়ে তক্ষুনি ছুট।

এই লাবণ্য! সেও ছুটছে। বনজঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেছে দু-জনে। দত্তদের আগবাগান সামনে।

এই শোন। পয়সা দিলি কেন! কী আনব?

কিছু আনতে হবে না। টিফিন করবে।

টিফিন! সে আবার কি! সে জানে না, স্কুলে গেলে টিফিনের জন্য পয়সা পাওয়া যায়। টিফিন তো ছুটি, এক ঘন্টা যে যার খুশি মতো ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে। টুলে বই পড়ে থাকে। টিফিনের সময়টুকু তাদের অবসর। কিন্তু পয়সা দিয়ে টিফিনে কি হয় সে জানে না। এক-দু'পয়সা কখনও-সখনও মেলা কিংবা

বান্নি উপলক্ষ গুরুজনরা দিয়ে থাকেন। বাড়ি গেলে মাও তাকে দু চার আনা দেয়। বলেন, খিদে পেলে কিছু কিনে খাস!

টিফিনে এক পয়সায় ছটা লজেন্স। চারটে বিস্কুটও এক পয়সায় পাওয়া যায়। খরার সময় এক পয়সায় দুটো খিরাই। টিফিনে পকেটে এক দু-পয়সা থাকলে, খিরাই কিংবা লজেন্স, বিস্কুট না থাকলে কিছু খায় না। স্কুলের পাশে বড় লিচু বাগান পোদ্দারদের। সেখানে দল বেঁধে গাছে ওঠে ওয়ারে ওয়া খেলে। কিন্তু দু-আনা পয়সা যে অনেক। দু-আনায় আটটা বড় সাইজের রসগোল্লা। দু-আনার যে সমগ্র বিশ্ব কেনা যায় সেদিনই প্রথম সে টের পেয়েছিল।

লাবণ্য বলল, টিফিনে কিছু কিনে খাবে। সেই কখন ফের। এতক্ষণ কেউ না খেয়ে থাকতে পারে?

তার মনে হয়েছিল, দু-আনা পয়সার সত্যি কত দাম?

সে অবাক হয়ে গেছিল।

নড়তে পারেনি। লাবণ্য অদৃশ্য। সে কেমন কিছুটা বোকার মতো হাতের দু-আনা পয়সা দেখছিল। আর মনে হল সবুজ বৃক্ষ সব দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পাশে। পৃথিবীতে সে একা না। সারাদিনই বলতে পেটে কিছু পড়ে না। সকালে দুটো মুখে দিয়ে যায়। পড়ার সময় বড়মামীর যত ফুট ফরমাস শুরু হয়। হরেনদা গোয়াল নিয়ে জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত। ছোটমামা পাত্তা দেয় না। রাঙ্গামামা শহরে থাকে। ছুটি ছাটায় বাড়ি আসে। বড় মামা মেজমামা সব প্রবাসে। বড়মামীর কখন চূণ দোক্তা খয়েড় লাগবে কেউ জানে না।

সে পড়তে বসলেই মঞ্জু হাজির। হাতে ফর্দ।

ফর্দ মিলিয়ে সব নিয়ে আসতে হয়। বাজার কাছে না। রমার বাবার মুদিখানা বাড়িতে। পান সুপারিও রাখে। তা-ছাড়া বাড়ির গৃহদেবতার পূজো-আর্চার ভারও তার উপর সময়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ছোট দাদুর জ্বরজালা হলে, আত্মীয় বাড়ি গেলে ঠাকুর ঘরের সে বালক পুরোহিত। পূজার নিয়মকানুন ছোট দাদু শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রথম গণেশের পূজা। পরে পঞ্চ দেবতার। লক্ষ্মীর ধ্যান, সঙ্কল্প পাঠ তার মুখস্ত। এ-বাড়িতে সেই একমাত্র মুখের উপর কাউকে না বলতে পারে না। লাবণ্য থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে জ্বালা। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। বড়দাটা যে গোল্লায় যাচ্ছে বড়মামীর আসকারায় সে তাও বোঝে। বড়মামী কলকাতা থেকে চলে এসেছে। বাড়ির এখন বলতে গেলে গৃহকর্ত্রী। কলকাতায় বোমা পড়ায় তারাও চলে এসেছে।

বড়দাও স্কুলে যায়। উপরের ক্লাশে পড়ে। ইন্দ্রকে পাত্তা দেয় না। সে আগে স্কুলে বের হয়ে যায়। ফেরে খুশিমতো। বড়দা পালিয়ে সিগারেটও খায়। তার সামনে পড়ে যেতেই জোর ধমক, ইন্দ্র কেউ যদি জানতে পারে পিঠের হাড় গুড়ো করে দেব।

সে কাউকে বলেনি।

এমন কি বড়দা তাকে ডেকে একদিন বলল, এই ইন্দ্র শোন! সে কাছে গেলে একটা চিঠি ধরিয়ে দিয়েছিল। কাকে দিবি বল তো!

ক্ষমাকে।

সেনেদের বাড়ির মেয়ে। শাড়ি পরে। স্কুলের রাস্তায় বাড়িটা পড়ে। সে যাবার সময় দেখেছে, ক্ষমাদি জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। সেই চিঠিও সে দেয়। সিগারেট খায়, ধরা পড়েও যখন জানাজানি হয়নি, তখন ইন্দ্র খুবই যে বিশ্বাসী মনে হয়েছে হয়ত। বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামে বাড়ি ছাড়তে হতে পারে এও টের পেয়েছিল সে।

বড়দা বড়মামীর জন্যই তাকে বেশি তটস্থ থাকতে হত। বাড়িতে হাঁস পোষা হয়। সাঁজবেলায় ফিরে সেই হাস পুকুর থেকে তুলে আনার কাজও তার। লাবণ্য দেখত, ইন্দ্রদা হারিকেন হাতে পুকুরেরঘাটলায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাকছে, আয় তৈ তৈ। লাবণ্য এসে পাশে দাঁড়াত। ইন্দ্র এক হাতে ঢিল ছুঁড়ে হাঁসগুলিকে ঘাটের দিকে নিয়ে আসছে। একা এই সাঁজবেলায়, কখনও বেশ অন্ধকার হয়ে যেত। হাঁস তুলে আনতে না পারলে বড়মামীর চোপা শুরু হয়ে যাবে। এত এত খায় বলবে। কে যোগায় বলবে। সে সব দোষ মাথা পেতে নেয়। লাবণ্য একদিন মুখরা হয়ে উঠল।

হতেই পারে।

লাবণ্যর বাবা সংসার খরচ আলাদা পাঠায়। সবাই মিলে যা দেয়, লাবণ্যর বাবা একাই তা যোগান। তা-ছাড়া লাবন্যর নামে হিরণের নামে মাসোহারা আসে। সোনা মাসির নামেও। লাবণ্য মুখরা হতেই পারে। সে হঠাৎ সামনে হাজির। কারো দয়ায় তারা এখানে পড়ে থাকছে না।

কোথায় যাচ্ছ!

হাঁস তুলতে।

না যাবে না। বাড়িতে আর লোক নেই! তুমি একা খাও! আর কেউ খায় না! বড়দা মেজদা কী করে! তারা সব নবাবপুত্র! তুমি চাকর এ-বাড়ির। বল, বল চুপ করে থাকলে কেন! তোমার মান মর্যাদা বোধ নেই! তুমি কিছু বোঝো

না!

লাবণ্য!

চেঁচামেচিতে সবাই হাজির।

বড়মামী শুধু বলল, তেজ দেখ মেয়ের।

আর এতেই ক্ষেপে গিয়েছিল। —তেজ কিসের মামীমা। এটা তো আত্মসম্মানের কথা। ইন্দ্রদার পড়া নেই। যত কাজ তাকে দিয়ে। কেন আর সবাই কী করছে! সে পড়বেটা কখন শুনি!

সেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সহবৎ জান না।

সোনা মাসি কেন যে মাথা গরম করে ফেলল লাবণ্যর চুল ধরে ঝাকিয়ে দিল, তোমাদের জন্য শেষে আমাকে এ-কথা শুনতে হল! সহবৎ শেখেনি। সহবৎ কাকে বলে এ-বাড়ির বৌরা বোঝে! ইন্দ্র যা। তুলে আন বাবা। অশান্তি ভাল লাগে না।

লাবণ্য হঠাৎ আরও মেজাজ গরম করে ফেলল। চুল ধরায় তার মেজাজ আরও অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। সে কেমন হিতাহিতজ্ঞান শূন্য।

ইন্দ্রদা যাবে না। গেলে আমি তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব। দেখি, দাদুমণি আসুক। কাউকে ছাড়ছি না। বলেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল, ইন্দ্রদা তুমি মানুষ না। অপদেবতা। তুমি অপদেবতা! তারপর ভিতর বাড়ির দিকে ছুটে গেছিল।

ইন্দ্র যে কি করে!

তাকে দিয়ে এমন একটা নাটক সৃষ্টি করবে লাবণ্য, সে ভাবতেই পারে না। কোনো কাজের হুকুম হলেই সে দেখতে পেত লাবণ্য বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখছে। থামে গাল চেপে এই স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকা যে পরিবারে কত বড় ঝড় তুলে দেবে সে টের পেলে লাবণ্যকে বুঝিয়ে বলত, বুঝিস না কেন, শত হলেও আমি মামীদের গলগ্রহ। আমার বাবা তো কিছু দিতে পারেন না। কাজটাজ করে কিছুটা পুষিয়ে দিচ্ছি। আত্মসম্মানে লাগবে কেন। বাড়ির কাজ কাউকে তো করতেই হবে। হরেনদা কতদিক সামলাবে। সে জানে, লাবণ্যকে বুঝিয়ে বললে, সে এতটা ক্ষেপে যেত না। তাকে বোঝালে বোঝে

লাবণ্য রাতে খেল না।

হিরণ এসে বলেছিল, ইন্দ্রদা তুমি একবার দেখবে!

কী হয়েছে!

দিদি শুয়ে আছে। উঠছে না।

উঠছে না কেন ?

মা মেরেছে। মাতো আমাদের গায়ে কোনোদিন হাত তোলেনি। সবার সামনে অপমান। দিদি না খেলে মা খাবে না। বলতো কি অশান্তি !

ইন্দ্র বই তুলে হারিকেনের আলো সামান্য কমিয়ে দিল। ইন্দ্রর ঘরটা বাড়ির বাইরের দিকে। ঠাকুরঘর চণ্ডীর থান পাশে। এ-ঘরটায় একটা তক্তপোষে ছোটদাদু থাকেন। হরেনদা মেঝেতে শোয়। পাশের তক্তপোষটা তার। বালিশ তোষক চাদর মশারি সেই তোলে। সপ্তাহে সে নিজেই তার জামা প্যান্ট বিছানার চাদর কেচে নেয়। লাবণ্য এসেতক দেখছে। একদিন ঘাটে হঠাৎ লাবণ্য এসে বলল, সর। সে নিজেই কাচতে বসে গেল। লাবণ্য এত করে, এমন কি সে সকালে উঠে পূজার ফুলটুলও তুলে রাখে। পূজার আয়োজনে দেরি হয়ে যায়— স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যায়। চণ্ডির থানে সেবাইত আছে, গৃহদেবতার পূজা ছোটদাদুই করে থাকেন। এতে পরিবারের মঙ্গল হয়। সেবাইতকে ভার দিলে গৃহদেবতা অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন একটা আশঙ্কা আছে তাঁর। পূজার ঘরে যাবার কথা থাকলে লাবণ্য নিজেই সকালে উঠে স্নান সেরে চন্দন বেটে, ফুল তিল তুলসি হরতুকি সাজিয়ে আসন পেতে দেবে। দেবীর এত সব পবিত্র ইচ্ছে তাকে কেমন দিন দিন আকর্ষণে ফেলে দিচ্ছিল। দাদু কবিরাজদাদুর বাড়ি গেছে। পাশা খেলার নেশা আছে। দাদু বাড়ি থাকলে এত বড় অশান্তি বোধ হয় হত না। দাদু নিজেই হয়তো বলতেন, চল দিদি আমরা সবাই একসঙ্গে যাই। হাঁস তুলে আনি।

সে সোনামাসির ঘরে ঢুকে দেখল মুখে চাদর ঢেকে লাবণ্য শুয়ে আছে।

সোনামাসির ঘরে যখনই ঢোকে আশ্চর্য এক সুঘ্রাণ পায়। লাবণ্যর রুচিবোধ আছে। মাসির কাছ থেকেই পেয়েছে। যার যার ঘরে পড়ার টেবিল। তার কোনো পড়ার টেবিল নেই। সে তার তক্তপোষে বসেই পড়ে। তোষক উল্টে দিলে নরম শীতল পাটি। গরম পড়ে গেলে তোষকের উপর নরম পাটি পেতে দেবার নিয়ম। এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে।

গরম পড়েনি। সকালের দিকে রাতের দিকে ঠাণ্ডা আমেজ থাকে। টিন কাঠের ঘর। সিমেন্ট বাধানো ভিটি। একেবারে তকতকে ঝকঝকে। ঘরে খালি পায়ে লাবণ্য, হিরণ হাঁটাহাঁটি করে। বাইরে বের হলেই স্লিপার পায়ে দেয়। বারান্দায় স্লিপার রেখে তারা ঘরে ঢোকে। তাই নিয়ম। বাইরে থেকে ঘরে কোনো ইনফেকসান ঢুকে না পড়ে। এমনিতেই বাড়িতে জুতো পরার চল নেই। বড়মামী কলকাতায় থাকে। বড়মামা কলকাতায় বোমা পড়তেই ভয়ে পাঠিয়ে

দিয়েছেন। তারা যে গাঁয়ে থাকে না কলকাতায় থাকে হাবেভাবে বুঝিয়ে দিতে ছাড়ে না। অমলপুর জায়গাটা শহর নয়। মফস্বল জায়গা। সেখানে এ-সব ফুটানির দাম কানাকড়িও থাকার কথা না। অথচ পড়ার টেবিলে ফুলদানি। বাড়িতে গোলাপ, রজনীগন্ধা, বকুল ফুল শ্বেত জবা— কি ফুল নেই ! ঠাকুর পূজায় ফুল লাগে। ঠাকুর ঘরের পেছনে ফুলের সব গাছ। পুকুর পাড়ে বকুল গাছ।

হাতের গুণে ঘরটার শোভা বেড়ে গেছে কত।

টেবিলে ফুলদানি।

ফুলদানিতে কটা সূর্যমুখী ফুল। সূর্যমুখী ফুল এ-সময় ফোটে না। লাবণ্য জল সার দিয়ে অসময়ে সূর্যমুখী ফুটিয়েছে। সেই জমি কুপিয়ে দিয়েছে। সে লাবণ্য হিরণ এমন কি ছোটদাদু পর্যন্ত গাছগুলি বড় করতে সাহায্য করেছেন। তবে অসময়ের ফুল বলে বড় হয়নি। আকারে খুবই ছোট। একগুচ্ছ সূর্যমুখীর পাশে সাদা চাদরে শরীর ঢাকা লাবণ্য কেমন দূরের মনে হচ্ছিল।

আগে সে ঘরটায় ঢুকতেই সাহস পেত না।

লাবণ্যই হাত ধরে জোর করে টেনে এনেছিল। তার পায়ে ধুলোবালি বলে সংকোচ হচ্ছিল। লাবণ্য বলেছিল, তুমি এত ভীতু কেন বলত !

মঞ্জুদের ঘরে ঢুকলে বড়মামী রাগ করে। সে যায়ও না। কিন্তু সে এ-ঘরে আজকাল সহজেই ঢুকে যেতে পারে। শিক্ষা দীক্ষা রুচিবোধ কেমন যেন কিছুটা অন্যরকমের। এমন কি লাবণ্য তার সঙ্গে সাজবেলায় ঘাটলায় গিয়ে বসে থাকলেও মাসিমা কিছু মনে করে না।

সেই লাবণ্য শুয়ে আছে। টিনের দেওয়ালে মাসির হাতের কাজ করা ময়ূর, কোথাও ফুল, ডিমের আস্ত খোসা গুচ্ছ করে সাজানো। মাঝখানে ঝালর হয়ে ঝুলছে। ডিমের খোসায় নানা রঙের আশ্চর্য সব কারুকাজ।

ঘরটায় ঢুকলেই ইন্দ্রর কাছে অমলপুর জায়গাটা অন্য মহিমা পেয়ে যেত। ইন্দ্র বোঝে সরকারি আমলা বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বাড়িতে মেসোর বন্ধুরা আসেন। জন্মদিনে কেক কাটা হয়। লাবণ্য তাকে কত খবর যে দিত।

সে ডাকল, লাবণ্য।

লাবণ্য পাশ ফিরে শুল।

এই ওঠ। খাবি না।

লাবণ্য সাড়া দিল না।

একবার ইচ্ছে হয়েছিল টেনে চাদরটা সরিয়ে নেয়।

কিন্তু ইন্দ্র পারেনি। সংকোচ। লাবণ্যর ফ্রক উপরে উঠে যেতে পারে। খুব নিন্দার হবে। এতটা সাহস হবে কী করে। সে জানে লাবণ্য বড় হয়ে উঠছে। ছ সাত মাসেই যেন লাবণ্য সার জল পেয়ে বাতাসে আরও বেড়ে উঠছে।

কি রে খাবি না!

কোনো উত্তর নেই।

ইন্দ্র বলল, ঠিক আছে। তুই না খেলে আমরাও খাচ্ছি না।

আর তখনই যেন মনে হল লাবণ্য ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মেয়েটাতো ভারী ননীর পুতুল। ইন্দ্র বুঝতে পারছে না তার ফুঁপিয়ে কান্নার কি হল!

সোনামাসি ঢুকে বলল, না খায় না খাবে। তুই সাধবি না। তোদের জন্য আমার কথা শুনতে হবে! আমার মেয়েরা সহবৎ জানে না!

ইন্দ্রর খারাপ লাগছিল, আসলে তার জন্যই মাসিকে আজ কথা শুনতে হয়েছে। মাসিকে কিছু বলেনি ঠিক, তবে মেয়ে সহবৎ শেখেনি বললে গায়ে তো লাগবেই। মাসিরও দোষ দিতে পারে না। সে পড়েছে, মহাফাঁপড়ে।

সে বলল, সোনামাসি তুমি বল একবার।

ও সে মেয়ে! বাপ সোহাগী। তখনই বলেছি, অত আসকারা দিও না। কোথায় যেন ডিমাপুর সেখানে থাকতে মেসো বিকাল হলেই মেয়েকে নিয়ে ক্লাবে টেনিস খেলতে চলে যেতেন। মেয়েও হয়েছে, বাবা আমি যাব। ব্যস হয়ে গেল। চললেন। ব্যাসিনজার সঙ্গে। লাবণ্য সঙ্গে। এরা ছাড়া তাঁর যেন আর কেউ নেই!

ব্যাসিনজার ওদের প্রিয় কুকুর।

একদিন ইন্দ্র পড়ছে। সকালবেলা। শীতে কাবু। চাদর জড়িয়ে তক্তপোষে চলিত নিয়মের অঙ্ক কষছে। আর তখনই মনে হল পেছন থেকে কে তার চোখ দু হাতে চেপে ধরেছে। সেই প্রথম— লাবণ্য তার ঘরে ঢুকে গেছিল। সে বুঝতে পারেনি। হিরণ হতে পারে, মঞ্জু হতে পারে, লাবণ্য হবে ভাবেনি। সে দু-হাতে জোর করে চোখ থেকে হাত সরাবার চেষ্টা করছিল। ছুটির দিন। স্কুলে যাবার তাড়া নেই।

সে না বুঝেই বলেছিল, এই ছাড়! কে রে!

কেউ কথা বলছে না। কথা বললেও খুব ফিসফাস গলায়। যেন কে চোখ চেপে ধরেছে, পিছন থেকে, না বলতে পারলে তাকে ছাড়বে না।

সে বলল, হিরণ।

না। চোখ ছাড়ছে না।

মঞ্জু!

না। তবু হাত চেপে রেখেছে। তার পিঠে ঝুকে পড়েছে। সে টের পাচ্ছিল সামান্য নরম উঁচু স্তন তার পিঠে চেপে বসেছে। মঞ্জুর আছে। কিন্তু লাবণ্যর আছে জানত না। কারণ লাবণ্য সব সময় বুকের কাছে কুঁচি দেওয়া ফ্রক পরত। তা-ছাড়া মনে হয়েছিল, ফ্রকের এমন আশ্চর্য কাটিং যে মঞ্জু কলকাতার মেয়ে হয়েও জানত না। সেলাই কলে মাসি নিজেই ওদের ফ্রক বানায়। পূজার সময় তাকে প্যান্ট সার্টও করে দিয়েছে। সোনামাসি সত্যি এত জানে!

সে বলল, এই মঞ্জু, ডাকব বড়মামীকে! আমাকে জ্বালাচ্ছিস তুই!

কিন্তু নীরব।

এমন কথার পর মঞ্জু আর কিছু না হোক ভয়ে হলেও ছেড়ে দিত। তাকে নিয়ে মামীমার কোনো কথা বলতেই আটকায় না। ও-ঘরে কী মধু আছে শুনি!

এই মধু আছে কথাটা কত অশ্লীল সে বোঝে। তার তখন মরে যেতে ইচ্ছে হয়। রেগে গিয়ে বলবে, আমার ঘরে আসিস তো ঠ্যাং ভেঙে দেব।

মঞ্জুও দমবার পাত্র নয়।

এটা তোমার বাড়ি! তোমার ঘর!

ইন্দ্র আর কিছু বলতে সাহস পেত না।

ইন্দ্র আর কী করে, বলেছিল, লাবণ্য ছাড়। লাবণ্য ছাড়া আর কেউ না। হিরণ হলে এতক্ষণে হিহি করে হেসে গড়িয়ে পড়ত। কুচির নিচে কুঁড়ির মতো স্তন ফুটে উঠছে, সেদিন সে প্রথম টের পেয়েছিল।

সে ইচ্ছে করলেই চাদর টেনে সরিয়ে দিতে পারে না। কিংবা হাত ধরে টেনেও তুলতে পারে না। কাতুকুতু দিতে পারে না। কিছুই পারে না। তার এত খারাপ লাগছে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা। বাবা কাছে থাকলে তাকে মা মারতে সাহস পেত না। বাবার জন্যও ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারে।

ইন্দ্র আর পারল না!

তোর কি হয়েছে! কাঁদছিস!

মা মেরেছে!

মা মারবে না তো কে মারবে। তুই বুঝলি না মাসিমার কষ্টটা কোথায়! মাসিমা তোকে সাধ করে মেরেছে! ওঠ। কান্নাকাটি করলে খারাপ লাগে না। লক্ষ্মী ওঠ। তুই না খেলে আমরা খেতে পারব!

কে জানে কোথায় থাকে নিরাময়ের প্রলেপ। লাবণ্য মুখ থেকে চাদর সরিয়ে

তার দিকে তাকিয়েছিল। টল টল করছে ভিজে চোখ। বড় অভিমানী মেয়ে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল, হাত টেনে তুলে দিতে। পারল না। মাসি পাশের খাটে গুম মেরে বসে আছে।

হিরণ কাছে গিয়ে মাথার কাছে বসল, এই দিদি ওঠ না। ইন্দ্রদা এত করে বলছে, খারাপ লাগছে না।

লাবণ্য চাদর সরিয়ে ফ্রক টেনে দিয়ে উঠে বসার সময়ই জানুর নিচে প্যান্ট, এবং কুঁচি দেওয়া, আর কেন যে সে এক রহস্যময় পৃথিবীর গোপন অবস্থানের কথা ভেবে কিছুটা বোকা হয়ে গেল। নিরন্তর এক বীজের উন্মেষ ঘটছে শরীরে। সে বড় হচ্ছে, লাবণ্য বড় হচ্ছে। বড় হলে কী হয় সে জানে। তার কাছে লাবণ্য জীবনের কোনো দূরবর্তী বাতিঘর যেন মনে হল। এই আলোর ইশারাতেই সে তার যেন জীবনের ভাল মন্দ বুঝতে শিখবে।

এবং সে সহসা খুবই গম্ভীর হয়ে গেছিল।

অপরাধবোধ কাজ করছে। কেউ না আবার টের পেয়ে যায়। সে স্বাভাবিক হবার জন্য বলল, মাসিমা লাবণ্য উঠেছে, তুমি আর কিন্তু ওর উপর রাগারাগি কর না।

তাকে বাবা নিরুপায় না হলে এখানে পাঠাতেন না। সোনামাসি তা ভালই জানে। তার বই খাতাও কিনে দিয়েছে। লাবণ্য তাকে ডাকত, ইন্দ্রদা মা ডাকছে।

ঘরে গেলেই এক কথা, যখন যা দরকার বলবি। ছোটকাকা কত দিক সামলাবে। তোর নাকি ইতিহাস বই কেনা হয়নি! কিনে নিবি। বলে টাকা বাড়িয়ে দিতেন। বলতেন, মানুষের দিন সমান যায় না। তোমার বাবাতো ডাকসাইটে অশ্বারোহী ছিলেন। মেলায় বান্নিতে তাঁকে দেখার জন্য আমাদের তখন কি না কাঙ্গালপনা ছিল! ভাগ্যদোষে তাঁর ছেলের আজ কিনা এত হেনস্থা।

সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণের যুবক ঘোড়ায় চড়ে মেলায় এলে ভিড় জমে যেত। সাদা রঙের ব্রিচেসের আঁটোসাঁটো পোষাকে সুপুরুষ মানুষটিকে দেখার জন্য কী আগ্রহ! মেলায় চিৎকার উঠত। রায়েদের ঘোড়া রৌরব আসছে। ঘোড়াটা আসত দূর থেকে— দূর থেকেই কালো রঙের ঘোড়া প্রথমে দেখা যেত বিন্দুবত। দিগন্ত প্রসারিত মাঠ থেকে ঘোড়াটা বড়বাবুকে নিয়ে কদম দিচ্ছে বোঝা যেত। চৈত্র মাস এলেই বিল মাঠ শুকনো খটখটে। সারাদিন ঠা ঠা রোদ্দোর। সকালে বিকালে ঠাণ্ডা আমেজ। ঘোড়দৌড় দেখার জন্য পদ্মদির

সঙ্গে, বাড়ির ভাই বোনদের সঙ্গে মেলায় যাওয়া ছিল কোনো এক দূরাতীত প্রতীক্ষা। সেই বড়বাবু ঘরকুনো। কোনো আত্মীয়ের বাড়ি যান না। তার ইচ্ছে আছে একবার ঘুরে আসবে। বর্ষা এলেই মাঠ ঘাট জলে ভেসে যায়। নৌকোয় চারক্রোশ রাস্তা— একবার যখন আসাই গেল, তখন বর্ষাকাল এলে সব আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ঘুরে বেড়াবে মনস্থ করেছে। চলে গেলে আবার আসা হবে কি হবে না তাও সে জানে না। যুদ্ধ চলছে বলে সুযোগ পাওয়া গেল— এমনও ধারণা ইন্দ্রের।

পদ্মমাসিকে তোরা দেখিসনি! বর্ষা আসুক দেখিয়ে আনব। সোনামাসি লাবণ্যকে বলতে গিয়ে তার বাবার সম্পর্কে আরও কি যে বলত। সে তার কিছুই জানত না। সোনামাসি না বললে বাবার গৌরবের দিনগুলি তার কাছে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেত। ইন্দ্রদার কথা উঠলেই সোনামাসি তার মা-র, বাবার অহঙ্কারের দিকটাই বেশি তুলত। বলত, ছোটকাকাতো প্রায় বাজিই রেখেছিলেন, পাওনা দেনা, দরকার হয় নিজের নামে যা আছে সব বিক্রি করে দেবেন ঠিক করেছিলেন। মা-বাবা মরা ভাইজির জন্য এমন একজন সুপুরুষ অশ্বারোহীকেই যেন খুঁজছিলেন। একদিন মেলা থেকে ফিরে বললেন, কালই রওনা হচ্ছি। পিতম্বর চক্রবর্তীর বড় পুত্রটি বিবাহযোগ্য— মনে ধরেছে। দেখি কী হয়!

বেশি আশা! বড়দার এই টিপ্পনি ছোটকাকা গায়ে মাখেননি।

ইন্দ্র জানে না, সোনামাসি সেদিন বড়দাকে তড়পে ছিল। বিয়ের পরই বড়দা কেমন হয়ে গেল! পদ্মদির বিয়েতে তার কিছু দেবার মতো ক্ষমতা নেই বড়দা বলতেই সে মুখরা হয়ে উঠেছিল। তোমার আর কিছু থাকবে না। তোমারও ছেলেমেয়ে হবে। তখন বুঝবে।

ছোটকাকা বলেছিলেন, সোনা পাগলামি করিস না। আমারতো কিছু আছে। এই কিছুটা যে অনেক, এবং দরকারে তিনি সব বিক্রি করে দেবেন মনস্থ করতেই বড়দা মাথা পেতেছিল।

সম্পত্তি বলতে সবটাই প্রায় খুড়ামশাইয়ের নামে। সারাজীবন দাদাদের টেনেছেন। ঢাকার নবাব বাড়ির বিশ্বস্ত আমলা। জমি-জমা, ভাইপোদের বড় করা, মানুষ করা সব তাঁর হেপাজতে। সোনা নিজেও দেখেছে, বাবামশাই বড় নির্ভর করতেন ছোটকাকার উপর। মনমোহন কি বলে! মনমোহনের সাধই শেষ কথা। চণ্ডীর থান তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। সে তখন খুবই ছোট। এমন কী তার জন্মেরও আগে হয়তো। বড় হয়ে শুনেছে, সে কি ধূমধাম। নাঙ্গলবন্দের

বান্নি থেকে ফেরার পথে রাত হয়ে গেছিল। কাকা চরের শ্মশানের উপর দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। জ্যোৎস্না রাত। মনে হল আলপথে কোনো যুবতী তাঁকে অনুসরণ করছে।

আপনি কে?

সাড়া পাননি।

প্রশ্ন করার পরই দেখেছিলেন, সেই বিদেহী আত্মা অদৃশ্য। আবার কিছুদূর এসেই পিছনে তাকালেন। দেখলেন অনুসরণ ক্ষান্ত হয়নি। পেছন ফিরে প্রশ্ন করতেই জ্যোৎস্নায় অদৃশ্য। তিনি খুবই ত্রাসে পড়ে যান। এবং গাঁয়ের ভিতর ঢুকে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। পরে স্বপ্নে সেই দেবী দেখা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। তোর মঙ্গল হবে।

এটা ঠিক, তারা দেখেছে, দেবী জাগ্রত। বিপদে আপদে তিনি তাঁদের রক্ষা করে আসছেন। মানুষটা বিদেশে, মাসে মাসে মনি অর্ডার আসে, তাঁর খবরাখবর থাকে চিঠিতে— লাবণ্যকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি থাকে— ব্যাসিনজার এখন আবার খাওয়া দাওয়া করছে। বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে। বুঝিয়ে বললে বোঝে। লাবণ্য যেন ব্যাসিনজারের কথা ভেবে মন খারাপ না করে। আর্দালি রেইসিং-এর কথা লেখে। বিশ্বস্ত। লাবণ্যদির কুকুরের খাওয়া-দাওয়ায় কোনো ত্রুটি না হয় তালিকামতো সব এনে রাখে। রোজ বিকালে পাহাড়তলিতে তাকে নিয়ে দৌড় করায়। অফিস থেকে ফিরে এলে ল্যাজ নেড়ে পায়ে গড়াগড়ি যায়।

ইন্দ্র দেখেছে, লাবণ্যর নামেও চিঠি আসে। চিঠিতে কুকুরের খবরই বেশি থাকে। কুকুরের জন্য এত মায়া যার, সে তাকে বনজঙ্গলে পালিয়ে দু-আনা টিফিনের পয়সা দিতেই পারে।

লাবণ্য উঠে বসেছিল। ছোটদাদু বাড়ি এসে সব শুনে ক্ষুব্ধ। বড় বৌমাটি একটু বেশি আত্মপর তিনি জানেন। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার অজুহাতে কলকাতায় ভাইপোর কাছে চলে গেছিল। কখনও বিশ্বনাথ চিঠি দিত, ছোটকাকা, মেসের খাওয়া সহ্য হচ্ছে না, অম্ল অজীর্ন রোগে ভুগছি। বাসার বন্দোবস্ত করব ভাবছি। যদি অনুমতি দেন আপনার বৌমাকে নিয়ে আসতে পারি।

ইন্দ্র ক'মাসেই সব জেনে ফেলেছিল।

সোনামাসিই তার বড়দার নির্লজ্জ আচরণের কথা সুযোগ পেলে বেশ রসিয়ে বলত। বৌ ছেলে-মেয়ে ছাড়া কিছু বোঝে না। জেঠিমার কথা ভাবে না। সব

দায় কাকার। একটা পয়সা বাড়িতে পাঠায় না।

ছোটদাদু ঘরে ঢুকে সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন।

সোনা তুমি অন্যায় করেছ। এমন সুন্দর মেয়েটাকে তুমি মারতে পারলে! হাত তোমার কাঁপল না।

সোনামাসি বলল, সহ্য হয় কাকা। মেয়েরা আমার সহবৎ জানে না! কী না বলেছে!

তাই বলে তুমি মারবে! আর যদি কোনোদিন দেখেছি হাত তুলেছ, তোমাকে ধরে পেটাব। দিদিভাই আয়। আজ আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসব। বলে মাথায় হাত রাখতেই লাবণ্য বোধ হয় লজ্জায় পড়ে গেছিল।

যাচ্ছি দাদুমণি।

যাচ্ছি না। এস। আমার সঙ্গে এস। তোমার মার এত সাহস, আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের গায়ে হাত! আরে আমি তো মরে যাইনি। মরে গেলে তখন কে কি করছে দেখতে যাব না।

সোনামাসি বলল আর কি দিলে তো, যাও রয়ে সয়ে থাকত— এখন তো আর আমাকে পাত্তাই দেবে না।

তোমাকে পাত্তা দিতে যাবে কেন। আমি কি করতে আছি।

সোনামাসি জানে তার ছোটকাকার এমন দাবি করার সঙ্গত কারণ আছে। ছোটদাদুই নাকি লিখেছিলেন, ব্রজেশ্বর, তুমি সোনা এবং মেয়েদের পাঠিয়ে দেবে। যুদ্ধ তো ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। পত্রিকার খবরে ঘুম হয় না। তুমি কোন সাহসে মেয়েদের কাছে রেখেছ বুঝতে পারছি না। আমি তো বেঁচে আছি। পত্রপাঠ তাদের এখানে রেখে যাবে।

চিঠি না পেলে মেসোর ইজ্জতের প্রশ্ন ছিল। পরিবারে মানুষটি এ-কারণেই বড় জায়গা দখল করে আছেন। ছোটদাদু বলতেই পারেন, আমি আছি কি করতে!

॥ চার ॥

ইন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সিগনাল ক্লিয়ার না পাওয়ায় ট্রেনটা থেমে আছে। সে জানালায়। বড় অন্যমনস্ক। চিঠিটা সত্যি ঘোরে ফেলে দিয়েছে। জীবন থেমে থাকে না ইন্দ্র। যেন ছোটদাদু উপর থেকে কথা বলছেন।

এই আকাশমাঠ, রেলপথ এবং যাত্রীদের ওঠা নামা কিংবা অদূরে সব গ্রামের গাছপালা, শস্যক্ষেত্র-শ্যালো থেকে জল উঠছে ফাল্গুনের শেষদিক— মাঠ

এ-সময় খা খা করার কথা। অথচ কী আশ্চর্য সবুজ হয়ে আছে— এখন ধান চাষ বারোমাস। রেলে চড়লেই এটা মনে হয়। মানুষ তার জীবিকার জন্য অহরহ ফন্দি আটছে। প্রকৃতি মানুষের কত বশ এই সব শস্যক্ষেত্রের দিকে তাকালে সে বুঝতে পারে।

চিঠিটা পকেট থেকে বের করে ফের পড়ল। না আর কিছু লেখেনি। হিরণ ইচ্ছে করেই লেখেনি, না সে লেখার দরকার বোধ করেনি। হিরণ কি জানে, সে তার ছোটদাদুর দায় মাথায় নিয়ে বসে আছে। বয়েস হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে থা করেনি। মা-বাবা ভাইবোনের অন্নজল এবং শিক্ষাদীক্ষার কথা ভাবতে গিয়ে নিজের কথা ভাববার সময়ই পায়নি। ছোটদাদু যেন মনুষ্যত্বের দায় তার উপর চাপিয়ে এখন মজা দেখছেন। হিরণ কি জানে বিপদে আপদে আত্মীয়স্বজনের কেউ যদি থাকে তবে ইন্দ্র। ইন্দ্রকে খবর দাও।

সেই ভেবেই কি খবর দেওয়া। কিংবা হিরণ কি জানে, তার সঙ্গে লাবণ্যর এক অদৃশ্য কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হিরণ কী টের পেয়েছিল! লাবণ্যর কিছু হয়নি তো! কিংবা লাবণ্য কি হিরণকে দিয়ে চিঠিটা লিখিয়েছে! দেখতে চায় সেই কৈশোরের সবুজ ইচ্ছেগুলি এখনও তার মধ্যে বেঁচে আছে কি না!

আসলে সে বোঝে, তখনকার দিনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাবজজ মুন্সেফ এবং যে কোনো ছোট মাপের ইংরাজ আমলাদেরই দাপটের শেষ ছিল না। কি কাজ করতেন লাবণ্যর বাবা জানার আগ্রহ হয়নি। মানুষটির দশাসই চেহারা এবং সাহেবী কেতা তাকে যে কোনো কারণেই হোক কিছুটা মুগ্ধ করেছিল। তিনি বাড়িতে পাট ভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি পরতেন। অসুবিধা না হয় ভেবে ছোটদাদু পাকা বাথরুম করে দিয়েছিলেন কলপাড়ে। এত সব করে রেখেছিলেন, মেজজামাই আসছে ভেবে। এবং সোনামাসি এসে বুঝেছিল, ছোটকাকা বুঝতেই দিতে চান না, তারা নিজের বাড়িতে নেই। বিশ-বাইশ দিন ছিলেন, মানুষটির মনোরঞ্জনের জন্য বড় পুকুরে মাচান পর্যন্ত করে দিয়েছিলেন, মাছ ধরার হুইল আনিয়েছিলেন বারদীর হাট থেকে। মাছ শিকারের নেশা আছে তাঁর। সোনামাসি এবং তার মেয়েদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়, জলে পড়ে যাবে না এমন সব হেতু থেকেই ছোটদাদুর বড় বেশি সতর্ক নজর ছিল তাদের প্রতি।

রবিবারে ধোবা আসত।

সোনামাসি গুচ্ছের শাড়ি ফ্রক বের করে দিত। বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড়, ঢাকনা সব কেচে আসত। মেসোমশাই বুঝেছিলেন, বুড়ো মানুষটি তার ভাইজির জন্য অমলপুরের সব রকমের সুখ সুবিধার বন্দেবস্ত করে রেখেছেন।

সকালে মনোরঞ্জন এসে বলেছিল, সোনার বর কোথায়! তাকে দেখার সৌভাগ্য হবে? মনোরঞ্জন ঘাড়ে কাপড়ের বোচকা নিয়ে গড় হয়েছিল।

বাড়ির জামাকাপড় ধোবার বাড়ি যেত কালে ভদ্রে। হরেনদা দিয়ে আসত। কাছে নয়— পূব পাড়ার শেষ মাথায় ধোবার পাট। বাড়িতেই বেশি কাচাকাচি হত। ছোটদাদু হয়ত জানতেন, সোনার আগেকার অভ্যাস নেই। স্নান সেরে পাটভাঙা শাড়ি না পরলে স্বস্তি পায় না। মনোরঞ্জনকে খবর দিয়ে রেখেছিলেন।

এ-কারণেও মনে হয় যাবার সময় মেসো বেশ প্রফুল্লই ছিলেন। তবে হিরণ, লাবণ্য প্রণাম করতে গেলে সে টের পেয়েছিল মানুষটির চোখ ছল ছল করছে। সোনামাসি আর ঘর থেকেই বের হল না। একজন মানুষ কত প্রিয় হতে পারে ইন্দ্র টের পেয়েছিল সোনামাসির ঘরে ঢুকে। রুপোর লাঠিটা নিতে ভুলে গেছেন। পাইপের একটা বাক্স কারুকাজ করা। দুটোই বড় বেশি তাঁর নিজের— এতই বিমর্ষ সোনামাসি, লাবণ্য যে কারো খেয়ালই ছিল না। নৌকায় উঠে গেলে ছোটদাদুই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তোমার লাঠি কোথায়। একটা ছোট্ট মতো বাক্স ছিল, দেখছি না। নৌকায় উঠে সব তদারকি করতে গিয়ে ভুলটা ছোটদাদুই ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

ছুট ছুট।

ইন্দ্র দু-লাফে ঘরে ঢুকে অবাক।

সোনামাসি অঝোরে কাঁদছেন। তিনি আর ঘাটে যাননি। ধরা পড়ে যাবেন। কিংবা কোনো নাটক সৃষ্টি হয় এই ভেবেই হয়তো ঘরে বসেছিলেন।

তার এত খারাপ লাগছিল। বিছানার একপাশে সেই শৌখিন লাঠিটি হাতে নিতেই সোনামাসি তার দিকে তাকিয়েছিল। চোখ মুছে বলল, দেখ আর কি ফেলে গেল?

প্রিয়জনের বিচ্ছেদ এত কাতর করতে পারে সোনামাসিকে না দেখলে টের পেত না। সে আবার ছুট ছুট। ছুটতে গিয়ে পড়ে গেছিল। লাবণ্য, হিরণ, বড়মামী এবং বাড়ির সবাই ঘাটে— কেবল সোনামাসি নেই।

রওনা হবার দিনক্ষণ তিথি নক্ষত্রের সমাবেশ দেখে। ছোটদাদু বললেন, সামনের এক হপ্তা ভাল দিন নেই। তোমাকে ব্রজেশ্বর দু-দিন আগেই রওনা হতে হবে।

দু-দিন ইচ্ছে করলে থাকতে পারতেন মেসো। কিন্তু ছোটদাদু অস্বস্তিতে থাকবেন ভেবেই সোনামাসি রাজি হয়ে গেছিল! দুটো দিন জীবনে একসঙ্গে থাকার ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। বুড়ো মানুষটাকে অস্বস্তির মধ্যে

রাখার চেয়ে আগেই রওনা হয়ে যাওয়া শ্রেয় মনে হয়েছিল মাসির। ছোটদাদুর সকাল সকাল পূজা পাঠ সেরে ঠাকুরের ফুল বেলপাতা এনে দিয়েছিলেন, সোনামাসির হাতে। বলেছিলেন, ওর পকেটে রেখে দাও। বাক্সে রেখে দাও। যাত্রা নির্বিঘ্ন হোক।

তারপর থানে, গৃহদেবতার ঘরে পূজনীয়দের প্রণামপর্ব সেরে নৌকায় উঠে গেছিলেন তিনি।

সে যাবে সঙ্গে।

ছোটদাদু যাবেন। বিকালের স্টিমারে ওঠার কথা। কিন্তু লাবণ্য এমন কান্নাকাটি শুরু করে দিল যে শেষ পর্যন্ত তাকেও সঙ্গে দিতে হল।

নৌকায় লাবণ্য তার বাবার পাশটিতে চুপচাপ বসে। বর্ষার মাঠ ভেঙে নৌকা চলছে।

লাবণ্যর এক কথা, ব্যাসিনজারকে বলবে, যুদ্ধ থামলেই আমরা যাব। বলবে, আমরা ভাল আছি। আমাদের জন্য যেন মন খারাপ না করে।

ব্যাসিনজারকে বলবে, ইন্দ্রদা আছে। আমাদের কেউ কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

কী বলবে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ বলব। না বলে পারি। আমাকে একা দেখলেই ক্ষেপে যাবে। আসবার সময় তো বলে এসেছি, সবাই ক'দিন বাদেই ফিরে আসবে। মন খারাপ করে বসে থাকিস না। অবাধ্য হস না। রেইসিং-এর কথা শুনবি। ওতো অবুঝ নয় মা। সব বোঝে। তোদের ভালর জন্য রেখে গেলাম সেটা বুঝবে না!

ব্যাসিনজার লাবণ্যর কত প্রিয় সেই থেকেই ইন্দ্র টের পেয়েছিল।

সেদিনই কুকুর সম্পর্কে ইন্দ্র অনেক খবর পেয়েছিল। মেসো পাশ বালিশে কনুই রেখে শুয়েছিলেন। তার শিয়রে ইন্দ্র, লাবণ্য। ছোটদাদু গলুই-এ বসে তামাক টানছেন।

মেসো বললেন, বুঝলি ইন্দ্র, বাসি পচা মৃতদেহ, ময়লা খেতে অভ্যস্ত বলে চিরকালই মানুষের কাছে কুকুর ব্রাত্যজীব।

মেসো তোমাদের কুকুর ঘরে ঢোকে!

ঘরে মানে! ওতো লাবণ্য, হিরণের পাশে শোয়!

বলে কি! তারা তো একবার রান্নাঘরে কুকুর ঢুকেছিল বলে সব ফেলে দিয়েছিল। ঘর ধোওয়া মোছা, গঙ্গাজল কত কিছুর দরকার পড়েছিল। হিরণ, লাবণ্যর পাশে একটা কুকুর শুয়ে থাকে শুনে সে হাঁ।

মেসো বললেন, জান তো মিশরিয়দের কল্পনায় মৃত্যুপুরীর দ্বারী আসুবিসের মুণ্ডুটা ছিল কুকুরের।

আর জান তো গ্রীক উপাখ্যানেও নরকের দরজা পাহারা দিত সারবেয়াস— সেই তিন মাথাওয়ালা কুকুর। যার সঙ্গে হারকিউলিস যুদ্ধ করেছিলেন। যাকে সঙ্গীতে মুগ্ধ করে আরশিয়াস তাঁর প্রিয়াকে ফিরে পান।

মহাভারতেও দেখেছ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের সঙ্গী ছিল একটা সারমেয়। নেহাৎ কুকুর বলেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তবে সুখের বিষয় ধর্মপুত্রের কিছুটা কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। তাই সুখদুঃখের সহচরটিকে সঙ্গে না নিয়ে তিনি সশরীরে স্বর্গলাভের প্রলোভনও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমন যে কুকুরপ্রেমী ইংরাজ জাতি তাদের কাছেও একসময় গড-এর বিপরীত ছিল ডগ। হয় গড নয় ডগ। কেউ ছোট নয় বড় নয় বুঝলে!

ইন্দ্র এত কথা জানে না। সে হারকিউলিসের নাম জানে না! সে কে? এমন কি সারবেয়াসও। আশ্চর্য সব নামের তালিকা মানুষটির মুখে কোনো এক গভীর অরণ্যের খবর দিচ্ছিল যেন। সঙ্গীতে মুগ্ধ করে আরফিয়াস সারবেয়াসের কাছ থেকে প্রিয়াকে ফিরে পান। ব্যাসিনজার যেন সারবেয়াসের মতো লাবণ্যকে পাহারা দিত। এমনই মনে হল তার।

ব্যাসিনজার কি বেঁচে আছে!

কুকুর কতদিন বাঁচে মেসোমশাই?

দশ বার বছর। তার বেশি বাঁচে বলে জানি না।

তবে ব্যাসিনজারের বেঁচে থাকার কথা নয়।

ইন্দ্রর ঠোঁটে সামান্য হাসি খেলে গেল। কী সব ছেলেমানুষী ভাবনা! গাড়িটা আবার যাচ্ছে। কয়লার গুড়ো এসে ধোঁয়ার সঙ্গে কামরায় পড়ছে। চোখে চশমা আছে বলে রক্ষা।

বুঝলে ইন্দ্র, রেনেসার পর থেকে মানুষ যত কুসংস্কারমুক্ত হতে শুরু করল ততই কুকুরের প্রতি দেখা দিতে লাগল কৃতজ্ঞতাবোধ। সেই তিনশ বছর আগে কবি আলেকজান্ডার পোপের কি খেদোক্তি— ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে মানুষের চেয়ে কুকুরেরই বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের উদাহরণ বেশি। তাই আজও চিরবিশ্বস্ত, ধনীর এই অভিভাবক, দরিদ্রের এই বন্ধুটিকে আমরা ক'জনই বা ভাল করে চিনি।

কুকুর সম্পর্কে আলোচনা শুরু হওয়ায় আর তত ম্রিয়মান ছিল না লাবণ্য।

নৌকা যাত্রায় সামান্য এক জীব নিয়ে এত আলোচনা— যেন লাবণ্য বুঝিয়ে দিতে চায়— ইন্দ্র কখনও গেলে বুঝতে পারবে কী দুর্লভ জাতের কুকুর। একটা আস্ত নেকড়ে বাঘ।

মাঝে মাঝেই লাবণ্য বলছিল, জান ইন্দ্রদা আমার সাড়া পেলে ব্যাসিনজার অস্থির হয়ে পড়ে।

লাবণ্যর মধ্যে যে নিরীহ সুষমা আছে তাতে যে কোনো জীব প্রলুব্ধ হতে পারে। পরে বুঝেছিল, লাবণ্যর মায়া মমতা একটু বেশি। কেউ অনিষ্ট করতে পারবে না ইন্দ্রদা আছে কথাগুলি তার পছন্দ হয়নি। সে কি কুকুর। যে রাতদিন এমন দুই ছবির মতো সুন্দরী বালিকাকে পাহারা দেবে! এত সাহস ভাল না। যেন সেখানে ব্যাসিনজার ছিল, এখানে ইন্দ্রদা আছে তার ভিতরে কিছুটা ক্ষোভেরও জন্ম হয়েছিল।

লাবণ্যটা কি!

ভয় ডর নেই।

হঠাৎ হঠাৎ তার সাড়া পাওয়া যেত। সে স্কুল থেকে ফিরে জামা প্যান্টও ছাড়েনি। সহসা জানালায় মুখ— চুপ চুপি ডাকছে, ইন্দ্রদা শোনো। সে কাছে গেলে বলত, হাত পাত।

সে হাত পাতলে দেখত কলাপাতায় মোড়া সন্দেশ। না হয় পাতক্ষীর। বাড়িতে সুস্বাদু খাবার হত, বিশেষ করে মেসোমশাইর জন্য ক'দিন তো রান্নাবাড়িটা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যা কিছু ভালমন্দ সবাই পেত, লাবণ্যই টের পেয়েছিল, ইন্দ্রদাকে ডেকে হাতে কিছু দেওয়া হয় না। বড়মামী যা থাকে নিজের ঘরে নিয়ে তুলে রাখেন। তালের মালপো হল, বড়া হল, ঐ একবারই পাতে পড়েছিল সবার সঙ্গে। তারপর দু-দিন ধরে জের চলেছে খাওয়ার। তারাও পেয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রদার কপালে জোটেনি। সোনামাসি এটা টের পেয়েছিল আরও পরে। মানুষের এত ছোট মন হতে পারে সোনামাসি বোধহয় বিশ্বাসই করতে পারত না।

এই হাত পাতাই শেষে কাল হয়েছিল।

ইন্দ্র দেখল, ট্রেনের কামরায় ভিড়টা কিছু হাল্কা হয়েছে। একবার বাথরুমে যাওয়া দরকার। সেই কখন উঠেছে, ট্রেন যত গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটছে, তত টের পাচ্ছিল যাত্রী যত নেমে যাচ্ছে, তত উঠছে না। আগের সব স্টেশনগুলি ধরেনি— বড় বড় স্টেশন ছাড়া। এখন ট্রেনটা সব স্টেশনেই থামছে। সে উঠে বাংকে দেখল, এটাচি ঠিকই আছে। এটাচিতে জামা কাপড় ছাড়া বিশেষ কিছু

নেই। টাকা-পয়সা, আইডেনটিটি কার্ড পকেটেই রাখে সে। জরুরী বলতে সিগারেট। এটাচিতে দু-প্যাকেট সিগারেট রেখে দিয়েছে। যে জায়গায় যাবে, হাতের কাছে সব পাওয়া নাও যেতে পারে। কোথাও যাবার সময়, এ-বিষয়ে সে সবসময়ই সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। হাতের কাছে সিগারেট না পেলে সে কেমন জলে পড়ে যায়।

সে বাথরুমে ঢুকে চোখে মুখে জল দিল। তারপর বের হয়ে কিছুক্ষণ দরজায় হাত মেলে দাঁড়িয়ে থাকল। ট্রেনের এই অনির্দিষ্ট যাত্রা তার কাছে আজ বড়ই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। যেখানে যাচ্ছে, কি দেখবে গিয়ে জানে না। কারো সঙ্গে আজ কেন জানি তার কথা বলতেও ভাল লাগছে না। এমন কি ছিমছাম যুবতী দেখলে সে আকৃষ্ট হয়। এটা তার স্বভাব। এবং দেখার প্রলোভন থাকে। নারী মাত্রেই তখন তার কাছে দেবী। এবং সে কতরকমের যে কু-চিন্তায় ডুবে যায়।

আসলে সে বুঝতে পারে এটা শুরু হয়েছিল লাবণ্যকে দিয়ে। স্কুল থেকে ফিরে লাবণ্যকে না দেখলে তার মুখ ব্যাজার হয়ে যেত। কেমন যেন অধিকার বর্তে গেছিল, বাড়ি ফিরে সে দেখতে পাবে, ঠাকুরঘরের পেছনে লাবণ্য তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সে স্কুল থেকে না ফেরা পর্যন্ত লাবণ্য বোধ হয় অস্বস্তিতে থাকত। সেও স্কুল ছুটি হলে এক দণ্ড দেরি করত না।

এবং এ-ভাবেই লাবণ্য এক গভীর নিস্তরঙ্গ জীবনে সমুদ্রের মতো আছড়ে পড়েছিল।

এখন তার সব ঠিক-ঠাক মনে পড়ছে না। তবু মনের গোপন অভ্যন্তরে আশ্চর্য এক জীবন আছে সে টের পায়। রুপোর কৌটো। একটার ভিতর আর একটা— এবং ছোট থেকে আরও ছোট সেই মনিকোঠায় আবিষ্কার করতে পারে সব। তবে দ্যুতি কখনও চোখ এত ঝাপসা করে দেয়, ভাবতে পারে না, সময়টা গ্রীষ্মকাল না বর্ষাকাল। জ্যোৎস্না ছিল, না কৃষ্ণপক্ষ ছিল! লাবণ্যর রাগ পড়ে গেছে। একসঙ্গে ছোট ঠাকুরদা, সে, লাবণ্য, হিরণ রান্নাবাড়িতে খেতে বসেছিল।

পরিবারে প্রথম লপ্তে বাড়ির পুরুষদের পাত পড়ে। মেয়েদের পরের লপ্তে। বাড়ির এমনই নিয়ম। সেদিনই প্রথম লাবণ্য ছোট দাদু হিরণ একসঙ্গে খেতে বসে টের পেল, শেষ পাতে সবাইকে দুধ বাতাসা দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রদা চুপচাপ বসে আছে।

ছোট দাদুর মুখ এ-সময় কিছুটা ব্যাজার।

লাবণ্য দুধে হাত দিচ্ছে না।

ইন্দ্র বলল, খা। বসে থাকলি কেন ?
তোমারটা কই !
আমি দুধ খাই না।
ছোট দাদুর মুখ আরও ব্যাজার হয়ে যাচ্ছে। লাবণ্য আবার কি উৎপাত শুরু করবে কে জানে !
তুমি সত্যি খাও না !
দুধ খেতে ভাল লাগে না।
লাবণ্যর কী যে মতি—সে বলল, দুধ না খেলে মগজের পুষ্টি হয় না জান।
বড়মামী হেসেল থেকে মুখ বার করে বললেন, তুই খাচ্ছিস খা না। ইন্দ্রকে নিয়ে পড়েছিস কেন। ও তো দুধ খায়না বলেই, দেওয়া হয় না।
আসলে ইন্দ্র দুধ খায় না বলা ছাড়া সেদিন আর কোনো উপায় ছিল না। এমন দৃষ্টিকটু আচরণ বড় মামীকে সবার কাছে আবার না খাটো করে দেয় ! এ-বাড়িতে প্রথম আসার পরই টের পেয়েছিল, বাড়ির সে একজন আগন্তুক—আগুন্তুকেরও আদর আপ্যায়ণ থাকে—আসলে সে মামাবাড়িতে গলগ্রহ। ছোট দাদু বড় বৌমার ছোট নজর খুব জানেন। তবে অশান্তির ভয়ে তাকে নানা অনিয়ম হজম করে যেতে হয়। ইন্দ্র বাড়িতে পা দিয়েই তা বুঝেছিল।
রাতে খেতে বসেই দেখল, দাদু মামা মেজদা বড়দা সবার শেষ পাতে দুধ। নিরামিষ ঘর থেকে বড় মামীর নির্দেশ মতো মেজদিদিমা বাটিতে বাটিতে দুধ পাঠিয়েছেন। ছোট দাদু এ-হেন দৃষ্টিকটু আচরণে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারলেন না। তিনি দুধের বাটি সরিয়ে দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। ইন্দ্র যে কি করে। সে তাড়াতাড়ি বলে ফেলেছিল, আমি দুধ খাই না। দুধ খেলেই বমি পায়।
ছোট দাদু তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। মাথা নিচু করে খেলেন। কে জানে মা-বাবা মরা ছেলেটার দুঃখে তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল কি না। সে ঠিক জানে না—কেন ! তবে সেদিন এ-ছাড়া বাড়িটাকে অশান্তির হাত থেকে রক্ষাও করতে পারত না।
পরে সবার কাছে গা সওয়া হয়ে গেলেও ছোট দাদু বড় বৌকে ক্ষমা করতে পারেননি। একদিন ছোট দাদু রেগে বলেছিলেন, যদি মনে কর তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে, বাপের বাড়ি চলে যেতে পার। বড় মামার নাম করে বলেছিলেন, চিঠি দিচ্ছি, তোমাদের যেন নিয়ে যায়।
তখন বড় মামীর এক কথা ! কতটুকু দুধ হয়, কলকাতায় খাটি দুধ পাওয়া

যায় না। ক'দিনের জন্য একটু খাটি দুধ মাছ। তাও সহ্য হয় না !
সহ্য হয় না কথাটা ইন্দ্রকে ঠেস দিয়ে।
ইন্দ্রের জন্যই হুমকি, বাড়ি ছাড়ার।
সারাজীবনই তো ইন্দ্র পড়ে থাকবে গাঁয়ে। আজ না হয় কাল খাবে। ওর কিছুকাল দুধ মাছ না খেলেও যেন চলে যাবে। বড় মামী এমনও অজুহাত তুলেছিলেন।
ইন্দ্র দেখল, বসে আছে লাবণ্য। দুধের বাটি সামনে। সে স্পর্শ করছে না। একটা হারিকেন জ্বলছে। টিনের দো-চালা লম্বা ঘর প্ল্যাটফরমের মতো। পার্টিশান করা। ও-পাশে হেঁসেল। দু-বার বড় মামী উঁকি দিলেন। মেয়েটাতো ভারি নচ্ছার। চোখে মুখে তিক্ততা ফুটে উঠছে।
লাবণ্য খেল না।
ছোট দাদু বললেন, তোর আবার কী হল ! দুধ খেলে তোরও কি বমি পায় !
লাবণ্য হেসে বলল, পেট ভরে গেছে। খেতে পারছি না।
ছোট দাদু ছাড়বার পাত্র নয়। বললেন, ভাত মেখে না খাস দুধটুকু চুমুক দিয়ে সাবার করে দে।
ও বাবা, খেলে মরে যাব। পেট ফেটে যাবে।
ইন্দ্র কিছু বলছে না। এ-মেয়েকে বাগে আনা তারও সাধ্য নেই। তবু বলল, অমলপুরে এমন খাঁটি দুধ কোথায় পাবি !
লাবণ্য ইন্দ্রর দিকে না তাকিয়েই বলল, বাবা এ-দুধ খেলে হজম হবে না !
ইন্দ্র ভয়ে আর কথা বাড়াল না। সাঁজবেলায় যা দেখেছে শেষে এই দুধ নিয়ে কি আবার খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে বড় মামীর সঙ্গে কে জানে। একসঙ্গে খেতে বসলে সবার সঙ্গে উঠতে হয়—না হলে বেয়াদপি—তাই ইন্দ্র হাত তুলে বসেছিল।
লাবণ্য কিছুতেই দুধের বাটি স্পর্শ করল না।
রান্নাবাড়ির উঠোন পার হয়ে আতাবেড়া। পাশে আমলকি গাছ—তার ছায়া। জায়গাটা সামান্য অন্ধকার। ইন্দ্র হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। আর তখনই মনে হল পেছন থেকে কে তার জামা টেনে ধরেছে। রাতের অন্ধকারে সে একা চলাফেরা করতে কিছুটা ভয় পায়। অশরীরী আত্মারা ঘোরাফেরা করে। বিশেষ করে এই বিশাল বাড়ির চারপাশে ঘন জঙ্গল, অর্জুন গাছ, অশ্বত্থ গাছ, দক্ষিণে আমের বাগান—ঝিঁ ঝি পোকার ডাক সব মিলে এই অন্ধকার রাত তাকে কিছুটা কাবু করে রাখে। তখন কেউ জামা ধরে টানলে

হকচকিয়ে যাবারই কথা। সে আতঙ্কে ছুটতে গেলে বলল, ইন্দ্রদা আমি।

অন্ধকারে লাবণ্য।

নিরিবিলি জায়গা দেখে তাকে পাকড়াও করেছে। লাবণ্য কি চায়। সে বলল, এই ছাড়। কেউ দেখে ফেলবে।

দেখুক।

কী যে করিস না!

কথা আছে।

কাল শুনব।

না এক্ষুনি। এক পা নড়বে না।

সে তাকে গাছের আড়ালে টেনে নিয়ে গেল।

বল, সত্যি দুধ খেলে তোমার বমি পায়!

না, মানে!

মানে ফানে বুঝতে চাই না। বল বমি পায় কি না!

কী যে ফ্যাসাদে পড়ে গেল! বড় মামীকে সে ছোট করতে চায় না। সত্যি তো বড়দা মঞ্জুরা কলকাতায় এমন খাটি দুধ পাবে কোথায়! গরুর দুধও কমে আসছে। মেজ দিদিমার জন্যও দুধ আলাদা রাখতে হয়। রাতে তিনি শুধু খৈ দুধ খান। এতগুলি পাতে দুধ বড় মামী দেবেনই বা কী করে।

সে বলল, সত্যি বলছি বমি পায়।

গা ছুঁয়ে বল।

সে যে কী করে। তার চোখমুখ শুকিয়ে উঠেছে। গা ছুঁয়ে তো মিছে কথা বলা যায় না। তবে যে তার পাপ হবে। লাবণ্যর পাপ হবে। সে বলল, গা ছুঁয়ে কিছু বলতে নেই জানিস।

সত্যি কথা বলা যায়।

এরপর আর কি করে!

সে বলল, না বমি পায় না। দুধ তার প্রিয় খাবার। তারপর সব খুলে বললে, লাবণ্য ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। ইস, কি না কেলেঙ্কারি বাঁধিয়ে বসে। সেও ছাড়ল না। তুই আমাকে ছুঁয়ে বল, আর কেউ জানবে না!

কি জানবে না!

দুধ খেতে আমি খুব ভালবাসি।

লাবণ্য থম মেরে দাঁড়িয়েছিল।

ইন্দ্র চারপাশে নজর রাখছে। এদিকটায় কারো আসার কথা না। রান্নাবাড়ির

উঠোন দিয়ে লাবণ্যদের ঘরে ঢোকার দরজা আছে। বড় মামীর ঘরেরও। হরেনদা উঠোনে খেতে বসবে। গোয়াল বাড়ি থেকে একটা রাস্তা কুয়োর পাড় ধরে এদিকে এসেছে। একমাত্র ছোট দাদু আতাবেড়া পার হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে যাবেন। তিনিও চলে গেছেন। এত রাতে সুযোগ বুঝেই লাবণ্য তাকে পাকড়াও করেছে। সোনা মাসি বড় মামীরা খেতে বসবেন। হিরণ হয়তো হেসেলে থাকবে। ঠিক সময় বুঝেই লাবণ্য তাঁকে গাছের আড়ালে এনে দাঁড় করিয়েছে। একেবারে গা ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে। চুলের সুঘ্রাণ পর্যন্ত পাচ্ছে। কি এক মনোরম আচ্ছন্নতায় সে এত কাবু বুঝতে পারছে না! সামান্য দুধ নিয়ে মেয়েটার মধ্যে এত কষ্ট, ভেবে সে কেমন কিছুটা বিহ্বলও হয়ে গেছে।

লাবণ্য কি ভেবে তার গা ছুঁয়ে বলল, প্রমিজ, কাউকে বলব না। তুমি কষ্ট পাবে বললে। বলে তার বুকে মুখ লুকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

তারপর লাবণ্য ছুটে চলে গেল।

অন্ধকারে হারিকেন হাতে হরেনদা এদিকেই আসছে। বোধ হয় মনমোহন কর্তার তামাক সাজিয়ে দিতে গিয়ে এ-পথটা ধরতে হয়েছে।

ইন্দ্রর তখনও ঘোর কাটেনি! লাবণ্য তার বুকে মাথা রেখে কাঁদল কেন! সে বুঝতে পারছে না। এমন সুন্দর মেয়েটা ইন্দ্রর জন্য এত বড় কষ্ট বয়ে বেড়াবে, কাউকে বলতে পারবে না, সোনামাসিকেও না—পাথর চাপা কষ্ট—ইন্দ্রদা দুধ খেতে ভালবাসে। অশান্তির ভয়ে দুধ খেলে বমি পায় বলেছে—এই নিদারুণ দুঃখবোধে কেউ এত বেশি জর্জরিত হতে পারে লাবণ্যকে দেখার আগে টের পায়নি।

সে কিছুটা স্তব্ধ হয়ে গেছে গাছের নিচে। তার যেন কিছু খেয়াল নেই। সে কেন আমলকি গাছের নিচে এ-ভাবে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারছে না। ভিতরে কি যেন ঘটে যাচ্ছে। তোলপাড়। এবং এক গভীর বনভূমির মধ্যে যেন সে দাঁড়িয়ে, লাবণ্য দাঁড়িয়ে।

তখনই হরেনদা তাকে গাছের নিচে আবিষ্কার করে অবাক। কি করছেন এখানে! একা দাঁড়িয়ে আছেন।

তার কেমন সংবিৎ ফিরে এল।

সে কি ধরা পড়ে গেছে!

হরেনদা হারিকেন তুলে তার মুখ দেখল। বাড়ির জন্য মন খারাপ। যান। ঘরে যান। বিছানা পেতে রেখেছি।

হরেনদা তো তার বিছানা পাতে না। সে নিজেই তোষকটা টেনে খুলে দেয়।

চাদর বিছিয়ে নেয়। মশারি টাঙিয়ে নেয়। হরেনদাকে আবার কে এই বাড়তি কাজটা চাপিয়ে দিল!

তুমি করতে গেলে কেন?

আমি কি করেছি! লাবণ্যদি যে বলল, ইন্দ্রদার বিছানাটা করে দাও আজ। কাল থেকে আমি করব। মনটা ভাল নেই।

কী আরম্ভ করল লাবণ্য! সে তো নিজেই সব কাজ তার করে নেয়। কাচাকাচি সব। লাবণ্য ঘাড়ে তুলে নিতে চায় সব। এটা বাড়াবাড়ি। কথা হতে পারে। সোনামাসি বাইরে ঘুরে ঘুরে অন্য স্বভাবের হয়ে গেছে। ভাই বোনের মেশামেশি তার কাছে খারাপ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু বড় মামী ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। গাঁয়ের মেয়ে, গরীবের মেয়ে—রক্ষণশীল—কলকাতায় থেকেও মন খোলামেলা হয়নি। না হবারই কথা। সে তো খুব যে সাধুপুরুষ তাও না। সে তো লাবণ্যকে ঠিক নিজের বোনের মতো ভাবতে পারে না। বরং লাবণ্য লণ্ঠন হাতে কোথায় যেন তাকে নিয়ে যেতে চায়। লাবণ্য না সে! যেই হোক সেই লণ্ঠনের আলোয় অন্য এক পৃথিবীর ইশারা সে খুঁজে পাচ্ছে। বাড়ির জন্য তার আর মন খারাপ করে না। ভাইবোনদের কথা ভাবলে আর খুব কষ্ট হয় না। সে এতদিন নিঃসঙ্গ ছিল, নিঃস্ব ছিল। লাবণ্য এসে যাওয়ায় এক দূরবর্তী তারবার্তা তার কানে অহরহ টরে টক্কা বাজিয়ে চলছে।

বিছানায় শুয়ে তার এত অশ্রুপাত কেন। কার জন্য। কার কথা ভেবে তার চোখ এত ভিজে যাচ্ছে। কেন সে বালিশে মুখ গুঁজে দিয়েছে। ছোট দাদু বাইরে। তিনি এখন বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াবেন। মন্ত্র পাঠ করবেন। বাড়িটার উপর নিশিথে চোর ছ্যাচোর, অশরীরী আত্মা এবং সব অশুভ প্রভাব বিরাজ করতে না পারে সেই হেতুতে তাঁর এই মন্ত্রপাঠ।

সে একা ঘরে। বাইরের গভীর অন্ধকারে অজস্র কীটপতঙ্গের আওয়াজ। কেমন যেন ধরনী নিজের মতো নিশিথে গোপন অভিসারে বের হয়েছে। দিনের বেলায় এই সব কীটপতঙ্গের আওয়াজ টের পাওয়া যায় না। রাত গভীর হলে তারা জেগে যায়। শরীরেও থাকে কীট দংশনের জ্বালা। আজ বিছানায় শুয়ে লাবণ্যর সংলগ্ন হওয়া এবং নারীর স্পর্শে এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জীবন, ভেবে তার ঘুম আসছিল না।

সে এ-পাশ ও-পাশ করছে। আজ বালিশটাও কেন শক্ত ঠেকছে মাথায় বুঝতে পারছে না। জানালা খোলা। হাওয়া ঢুকছে। বোধ হয় বসন্তের হাওয়া। মশারি ফুলে উঠছে।

এই রাতে তার শরীরও ফুলে উঠছে।

কেমন শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল। এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সে টের পেল এক অস্বাভাবিক কষ্ট। সেই জানুদেশ, এবং গোপন গভীর অন্তহীন রহস্য তাকে অস্থির করে তুলল। যেন হাতে মুখে জল দিলে ভাল হত। ঘাড়ে গলায়। এত বেশি কু-চিন্তা করছে বলেই তার রমকূপে ঝড় উঠেছে। সে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল। জানালায় তাকিয়ে থাকল। জ্যোৎস্নায় গাছপালা ভেসে যাচ্ছে। গাছপালা পার হয়ে পুকুরের ঘাট। কিছু জোনাকি পোকা উড়ছে। শেয়ালেরা ডেকে গেল। কুকুরের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে। স্কুলের পথটা মনে করার চেষ্টা করল। স্কুলে যাবার রাস্তায় খিরাইর জমি পড়ে। মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে সে খিরাই চুরি করে থাকে। বিলের দিকটায় মোত্রাঘাসের জঙ্গল। সেখানে সে যেন পাহারা দিচ্ছে। কেউ ধরা পড়ে না যায়। এতেও সে দেখছে বার বার লাবণ্যই ঘুরে ফিরে চোখে ভেসে উঠছে।

মা বাবার কথা মনে করার চেষ্টা করল। পারল না।

হাঁস তুলে আনছে পুকুর থেকে। সাঁজ লেগে গেছে। পুকুরের ও-পারে বোন্নাগাছের ডাল ভেঙ্গে জলে ফেলে দিচ্ছে—তবু হাঁসগুলি পাড়ে উঠছে না।

এই সব করেও যখন সেই এক কু-চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিল, কারণ একজন উঠতি বালকের পক্ষে এটা মারাত্মক ব্যাধি, তার এমনই মনে হচ্ছে—সে গায়ত্রী জপ শুরু করে দিল। দাদুর এটা টোটকা। ভয় পেলে, গায়িত্রী পাঠ, দুঃস্বপ্ন দেখলে গায়িত্রী জপ, সবত্রাস থেকে উদ্ধারের মোক্ষম অস্ত্রটির ব্যবহারে সে দেখল আশ্চর্যভাবে শীতল হয়ে গেছে শরীর—এবং সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

আর স্বপ্নের ভিতর সেই তাণ্ডব। যা অনুভবের বাইরে, অভিজ্ঞতার বাইরে—একী হচ্ছে! স্বপ্নটা যে কোনো ফুলের উপত্যকা! নারী বসে আছে জানুর সন্ধিস্থল তুলে। না, নারীর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। নির্গত হচ্ছে, হচ্ছে, পরম আরামবোধ এবং অবসাদ কেটে যেতেই সে জেগে গেল। দেখল, প্যান্ট ভেসে গেছে। সে বোকার মতো হাত দিল, চ্যাট চ্যাট করছে। আঠা আঠা। সে বুঝল তার ভিতরে কোনো গভীর গোপন অসুখের জের এটা।

॥ পাঁচ ॥

একটা হল্ট স্টেশনে ট্রেন থেমে আছে। ছাড়ছে না। সামনের স্টেশনে যাত্রী হকারে হাঙ্গামা। রেল অবরোধ। যাত্রীদের বলাবলি থেকে সব টের পাচ্ছে। তার কথা বলতে ভাল লাগছে না। এখান থেকে নেমে হাঁটা পথে মাইলখানেক গেলে পাকা-সড়ক। হেঁটে গেলে বাস পেতে পারত। কিছু যাত্রী নেমেও গেছে। দূরের রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে বাস ধরবে বলে। স্টেশনে কোনো খবর নেই। অন্য সময় হলে সে স্টেশন-মাস্টারকে তার পরিচয় পত্র দেখিয়ে সব খবরাখবর নিত। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তাকে কেমন জড়তায় পেয়ে বসেছে। পৃথিবীর কোনো খবরই আগ্রহ সৃষ্টি করছে না। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা হলেও সে যেন এ-ভাবে বসে থাকত।

আসলে ভিতরে কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। অজ্ঞাতবাসের পালা শেষে বোধ হয় হিরণের চিঠি—খুব বিপদ। হিরণ কিংবা সোনামাসির, না আর কারও। লাবণ্যর বিপদ লিখতে পারত। কারণ হিরণ জানে এক সময়ে লাবণ্য ছাড়া সে কিছু বুঝত না। লাবণ্যকে খুশি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা তার কেন, সমবয়সী মেয়েটির টের না পাবার কথা নয়। লাবণ্যর বিপদ চিঠিতে লেখা থাকলে সে বিচলিত হয়ে পড়বেই এমন ভাবতেই পারে। আবার নাও পারে। দীর্ঘকাল বাদে কে কোন স্টেশনে সেটে যাবে কেউ বলতে পারে না। কিভাবে কার গ্রহ তৈরি হয়ে যাবে কেউ জানে না। যে যার মতো নিজস্ব গ্রহ তৈরি করে নেয়। ইন্দ্র যে নেয়নি, কে বলবে।

এমন ভাবতেই পারে।

তার কাছে স্মৃতি এখন মহাভারত হয়ে আছে। এক জীবনে লাবণ্যকে ছাড়া পৃথিবী তার কাছে অন্ধকার।

লাবণ্যর কাছে সে ধরা পড়ে যাবে—আর কি না করল লাবণ্য!

এই ইন্দ্রদা, ওঠো কত বেলা হয়েছে!

লাবণ্য না ডাকলে সে উঠত না। ইন্দ্রকে হাত টেনে বিছানা থেকে তুলে দিয়েছিল। আমলকির ছায়ায় তার অধিকার কতটুকুন বুঝিয়ে দিয়েছে। লাবণ্য নিজেও তারপর দুধের বাটি সরিয়ে দিত। দুধ খেত না। তার বমি পায়—ইন্দ্রদার বমি পেলে তার পাবে না হয় কি করে!

কিন্তু যা করল!

সে উঠছে না। সারা শরীরে অবসাদ। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। এক আশ্চর্য

উপদ্রবের শিকার। এটা কী যে হয়ে গেল!

জ্বরজ্বালা হলে সে এতটা মুষড়ে পড়ত না। এমন কি গুটি বসন্ত হলেও সে বুঝত অসুখ—নিরাময়ের সুযোগ আছে। কিন্তু তার এই নতুন অসুখটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। কাউকে বলাও যাবে না। তার রুচিবোধ প্রখর। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। পরিবারের সুনাম নষ্ট হয় এমন আচরণ করতে কখনও সাহস পায় না। এমনিতেই চাপা স্বভাবের। স্কুলপথে দস্যুপনা দলে পড়ে। সে যে কি করে!

লাবণ্য তো তার ঘরে সকালে আসে না! সে সকালে ওঠে—পূজায় ফুল দুর্বা তুলসিপাতা তুলে ঠাকুরঘরে রেখে দেয়। লাবণ্যর দেবদ্বিজে ভক্তিতে ছোট দাদু খুবই প্রীত। এবং তিনি একমাত্র লাবণ্যকেই দিদিভাই বলে ডেকে খোঁজ করেন।

তারও মনে হয়েছে, লাবণ্য ফুল গাছের নিচেই সুন্দর। সবুজ দুর্বাঘাসে শিউলি ফুল ঝড়ে থাকে। শরত হেমন্তে সে ঘুম থেকে উঠেই দেখেছে নিবিষ্ট মনে সাঁজিতে ফুল তুলছে উবু হয়ে। সে কাছে গেলে ফ্রক টেনে হাঁটু ঢেকে দিত। সে দাঁড়িয়ে থাকলে বলত, বেশ মজা, বাবু ঠাকুর ঘরে শুধু ঘণ্টা নাড়বেন। তুলে দাও না দুটো ফুল। বাসি মুখে ফুল তোলা যায় না। দাঁড়া আসছি, বলে সে দৌড়ে ঘাটে চলে যেত। হাতমুখ ধুয়ে সে পাশে বসে ফুল তুলত।

আর তখনই অমলপুরের গল্প। সেখানে তারা দু-বছর হল এসেছে। বাবা আবার বদলি হয়ে কোথাও চলে গেলে অমলপুরের জন্য কষ্ট হবে এমন বলত।

এ-ভাবেই দু-জন ধীরে ধীরে কীভাবে যে অন্তরঙ্গ হয়ে গেল! অমলপুরের গল্পে বার বার ঘুরে ফিরে আসত কুকুরটা।

অথচ সেদিন তার কিছুই ভাল লাগছিল না। এমন কি রাতে উঠে সে প্যান্টও পাল্টায়নি। ভিজা প্যান্টে শুয়েছিল। সকালে দেখেছে, সব খট খটে শুকনো। প্যান্টের খানিকটা জায়গা শক্ত হয়ে আছে। তার চাদরও কিছুটা ভিজে গেছিল। তবে এতে কোনো দাগ লেগে থাকে জানবে কী করে। সে উঠে মশারি খুলতে গিয়েই অবাক। কেমন একটা ছাই রঙের মানচিত্র তৈরি হয়ে আছে চাদরে।

তার গলা শুকিয়ে উঠছে। ইস ধরা পড়ে না যায়! সে চায়ও না, ধরা পড়ুক। তাড়াতাড়ি মশারিটা কোনরকমে ফেলে তোষক ওল্টে রাখলে লাবণ্য বলল, এক্কেবারে আনাড়ি।

বেশ আনাড়ি! যা তো এখান থেকে। সকালেই পেছনে লাগলি!

পেছনে লাগলাম! বিছানা তোলার ছিরি এটা! লাবণ্য বেশ ক্ষোভের গলায়

বলল।

আমার বিছানা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন। যাবি, না, মাসিমাকে ডাকব।

ডাক না!

শোন ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। আমার বিছানা আমি দেখব। আসলে কপাল। না হলে সেদিনই ঘটনাটা যে ঘটবে কেন। লাবণ্যকে সে সতর্কও করে দিয়েছে, আমার বিছানায় হাত দিলে ভাল হবে না।

লাবণ্য বলল, বয়ে গেছে। যেমন মানুষ তেমন সাজা। দুধ না দিয়ে ভালই করেছে। নিজের বিছানাটা পর্যন্ত তুলে রাখতে শেখনি! দুপদাপ করে বের হয়ে গেছিল।

ইন্দ্র হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার আলাদা চাদর নেই। আকাশ মেঘলা। ধুলে শুকাতে নাও পারে। আর সে যখন বলেছে, আমার বিছানায় হাত দিবি না, তখন লাবণ্যও আসছে না দেখতে। কারণ চাদর দেখলেই ঠিক চিৎকার করে উঠবে—ইস কি নোংরা দাগ। তোমার এই প্রবৃত্তি! এই নোংরা চাদরে শুয়েছ। তোমার কি ঘেন্নাপেও নেই! দাগ লাগল কী করে!

আসলে মেজাজ ভাল না বলেই তার ইচ্ছে হয়নি, চাদরটা তুলে নিতে। সকাল বেলায় কাচাকাচির সময় নেই। ছুটির দিন ছাড়া হয় না। মনমরা হয়ে গেছে। কাউকে বলা যাবে না। অথচ অসুখ। গোপন অসুখে সে বিব্রত। তার উপর লাবণ্যর খবরদারি একদম পছন্দ হয়নি। লাবণ্যকে সে সহ্যও করতে পারছিল না। যেন অসুখটা তার শরীরে লাবণ্যই আমদানি করেছে। সংক্রামক ব্যাধির মতো সে আলগা থাকতে চায়। লাবণ্যর দিকে তাকাবে না। কথা বলবে না। তাকে এড়িয়ে চলা দরকার। লাবণ্যকে নিয়ে রাতে বিশ্রী সব চিন্তা করেছে। কুকুর বেড়াল এবং গরু গাভীন হবার মুখে কী হয় সে সবই জানে—কিন্তু সে জানে না, সেই সঙ্গে শরীর থেকে কিছু নির্গতও হয়। আসলে অসুখটা তার একার।

সে স্কুলে গেল না। লাবণ্যর সঙ্গে কথা বলল না। সারাদিন বনজঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়াল। খালপাড়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। দুপুরের খাঁ খাঁ রদ্দুরে কাছারি বাড়ির পাশে ঘাসের উপর শুয়ে থাকল।

কেউ তাঁকে খুঁজতে এল না। রসর সঙ্গে দেখা। দত্তবাড়ির ছেলে। তাকে দেখেই ছুটে এল। —কিরে বসে আছিস চুপচাপ। স্কুলে যাসনি!

সে উঠে পড়ল। মানুষের কোনো সঙ্গই তার সহ্য হচ্ছে না। সে একা

থাকতে চায়। রসকে বলতে পারত, সমবয়সী। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। বাপের মুদি দোকান। দোকানে বসে মাঝে মাঝে। গরুর খোটা বদলাতে কাছারি বাড়ির মাঠে এসে তার খোঁজ পেয়ে গেল।

কিন্তু লাবণ্যর জন্য শেষপর্যন্ত নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারল না। সেই রসকে বলল, ইন্দ্রদা স্কুলে যায়নি। খায়নি। কোথায় গিয়ে বসে আছে। সেই রসর কাছে খবর পেয়েছে, বাবু কাছারি বাড়ির মাঠে বসেছিল, তাকে দেখেই সরে পড়েছে।

বাড়ির পিছনে ছাড়া বাড়ি। বেতের জঙ্গল। ঢোকা যায় না। কাঠ পিঁপড়ের উপদ্রব। কাঁটাগাছে ভর্তি। বড় বড় আমজাম গাছ— বেত কাঁটায় ঢেকে আছে। এমন এক গভীর জঙ্গলে লাবণ্য তার সাড়া পেল। এ-ভাবে আর্ত গলায় ডাকলে সাড়া না দিয়ে উপায়ও থাকে না। মনে হচ্ছিল, লাবণ্য যেন তার সর্বস্ব হারিয়েছে। ছোটদাদু বড়দা ডাকাডাকি করেছে। হরেনদা খোঁজাখুঁজি করেছে। সে সাড়া দেয়নি। বাড়ির শেষ সীমানায় জামরুল গাছ— ঐ পর্যন্ত যে কেউ নিরাপদে আসতে পারে। তারপরই কচুরিপানার বিশাল ডোবা পার হয়ে জঙ্গলটার শুরু। সে অনেকদূর থেকে লাবণ্যর গলা পাচ্ছিল। লাবণ্য বোধ হয় আর একটু বেশি হলে কেঁদে ফেলত। তারপর যদি গাঁয়ের সবার কাছে জানাজানি হয়ে যায়, ইন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না— তবে আর এক কেলেঙ্কারি! বিরক্ত হয়েই সাড়া দিয়েছিল, যাই।

কোথায় তুমি!

জঙ্গলের বাইরে এসে দাঁড়ালে কচুরিপানা ভর্তি ডোবার ও-পারে দেখল লাবণ্য সাদা ফ্রক গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ চোখ শুকনো। তার ভারি খারাপ লাগছিল। ইস অকারণে মেয়েটাকে সে কষ্ট দিয়েছে!

বাড়ি ফিরে চান করল। তার জামা প্যান্ট নিয়ে লাবণ্য ঘাটে বসেছিল। এটা বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল। লাবণ্য কি টের পেয়েছিল, ইন্দ্রদার জীবনে আজ বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে কিছু। যে কোনো মুহূর্তে কিছু করে বসতে পারে।

তার এককথা, তোমার কী হয়েছে বলবে তো! কথা বলছ না! সকালে কিছু খেলে না। স্কুল গেলে না। আমি খারাপ কিছু বলেছি। তুমি বল, ও বিছানায় মানুষ শুতে পারে। তুমি কি মানুষ না! আমার খারাপ লাগে না! তোমার একটা ভাল বিছানা পর্যন্ত নেই।

আর রাতে খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে ঢুকে ইন্দ্র অবাক। তার চাদর কে পাল্টে দিয়েছে। বালিশের ওয়াড়। সাদা ধবধবে পাট ভাঙা চাদর। কিন্তু তার চাদরটা

গেল কোথায়। কে সরাল ! তখনই মনে হল, ঠিক লাবণ্যর কাজ। হরেনদাকে বলেছে, আজ বিছানাটা করে দাও, কাল থেকে আমি করব। কিন্তু সাদা চাদরে তার শুতে ভয় করছে। আরও আতঙ্ক চাদরটা লাবণ্য নিয়ে রাখল কোথায় ! সে যদি ধরা পড়ে যায় ! তার মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকল।

দাদু ঘরে নেই। হরেনদা খেতে গেছে। সে একা ঘরে হারিকেন জ্বলছে। সে এ-মুহূর্তে বের হয়ে লাবণ্যকে একা পাবে না। রান্নাবাড়িতে তাদের খাওয়া দাওয়ার পাট চলছে। আর সবার সামনে বলতেও পারবে না, বিছানার চাদরটা রাখলি কোথায়। ওটাতো আর চাদর নেই। ওটা তার কলঙ্ক।

দাদু ঘরে ঢুকে বললেন, চাদর নষ্ট করেছ দেখছি। লাবণ্য তুলে নিয়ে গেছে। তা হয়। ধাতুর দৌর্বল্য থেকে হয়। সবারই হয়। তুমি কি সারাদিন এ জন্য মনমরা হয়েছিলে। তুমি এখন সাবালক। তোমার তো আনন্দ, আমরা যা হারিয়েছি, তোমার পূর্বপুরুষরা যা হারিয়েছেন, তা রেখে গেছেন তোমার মধ্যে। এর জন্য সারাদিন ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়ালে ! আশ্চর্য !

সে ধরা পড়ে গেছে।

লাবণ্য কী জানে !

দাদু বললেন, চাদরটা পেতে দেবার সময় বললাম, ওর তো দেখছি শুরু হয়ে গেছে। ওটা ফেলে রাখ। ধোবা এলে দিয়ে দিও। দাগ উঠবে বলে মনে হয় না। কু-চিন্তা কু-ভাবনা থেকে বিরত থাক। তবে বয়েসটার দোষ। তুমি কী করবে ! জীবনে এটাই স্বাভাবিক। না হলে অস্বাভাবিক হত। তোমার দোষ নেই। এটা অপরাধও নয়। তুমি যা চাপা স্বভাবের।

সে লজ্জায় মুখ নিচু করে রেখেছে।

ছোটদাদু এ-ভাবে কোনো গূঢ় গোপন কথা এত সহজে বলতে পারেন সে জানত না। তবু জানাজানি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি।

লাবণ্য তো বলল, দেখেছ দাদু, ইন্দ্রদার কাণ্ড। কিসের দাগ লাগিয়েছে। ওতেই শোয়। ঘেন্নাপেত্ত নেই !

তা-হলে লাবণ্য দেখিয়েছে ! মেয়েটার জ্বালায় শেষে না বাড়ি ছাড়তে হয় ! দাদু কী না ভাবলেন, কিন্তু দাদুর ঐ কথাটা— এটাই স্বাভাবিক। না হলেই অস্বাভাবিক। তুমি বড় হয়ে গেছ। তোমার পূর্বপুরুষরা তোমার মধ্যেও বেঁচে থাকলেন।

সে মাথা গোঁজ করেই বসে আছে। দাদুর সামনে যেন আর মাথা তুলে কথা বলতে পারবে না। দাদু তার আজ অন্তর্যামী। সে খারাপ। ধরা পড়ে গেছে।

দাদু কী বোঝালেন, কে জানে ! বললেন, ওটা হলে শরীর হালকা হয়। মাঝে মাঝে হওয়া ভাল। তবে বেশি হলে মেজাজ অপ্রসন্ন থাকবে। খিটখিটে মেজাজের হবে। এক কাজ করতে পার। শোবার আগে দশবার গায়িত্রী জপ করে শোবে। এতে চিত্ত শুদ্ধি হয়। যা বাড়তি তা তো ভাণ্ড থেকে উপচে পড়বেই। তবে নিজে ভাণ্ডটি থেকে জোর করে জল গড়িয়ে খেতে যেও না। এতে শরীর এবং মস্তিষ্কের অনিষ্ট হতে পারে।

দাদু তাকে কত স্নেহ করেন, এবং কত অনায়াসে তার আতঙ্ক দূর করে দিলেন ভেবে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল।

দাদু বললেন, এতে লজ্জার কিছু নেই। জীবজগতের এই নিয়ম। ঈশ্বর তার সৃষ্টি না হলে রক্ষা করতেন কী করে। সব শ্মশান হয়ে যেত। সব জড় পদার্থ, জীবনের চিহ্ন থাকত না। তিনি তো বিকশিত হতে চান। থাকতে চান। গাছপালা প্রাণীজগতে অহরহ তার অদৃশ্য খেলা চলছে। ভাবছ এটা তোমার দায়। মোটেই নয়। এটা তারই দায়। তুমি হেতু মাত্র। শুয়ে পড়। রাত হয়েছে। কাল আবার যেন স্কুল নাগা কর না। আমার শেষ তোমার শুরু। আমার কাছে কোনো গোপন কথাই তোমার না বলার মতো থাকতে পারে না। এ-ভাবে কেউ সারা দুপুর নিখোঁজ হয়ে থাকে ! আতান্তরে ফেলে দিয়েছিলে ! লাবণ্যটা যেন জলে পড়ে গেছিল। কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। তুমি ফিরলে, খেলে, তবে সে খেল। লাবণ্যর ভিতর মায়া দয়া একটু বেশি মাত্রায়। কেউ তোমার জন্য কষ্ট পেলে খারাপ লাগে না তোমার !

ইন্দ্র শুয়ে পড়েছে। সে হাঁটুতে প্রায় মুখ গুঁজে যেন শুয়ে আছে। তার ভয়, স্বপ্নে যদি আবার আজ কিছু হয়ে যায়। তাহলে ফের চাদর নষ্ট হবে, প্যান্ট নষ্ট হবে শার্ট হবে। এ-থেকে আত্মরক্ষার উপায়ও তার জানা নেই। সে আর একটা দুশ্চিন্তায় ডুবে যাচ্ছে। বোধ হয় মশারির ভিতর তার শুয়ে থাকার ধরন দেখে কিছু টের পেয়েছেন দাদু। হারিকেনটা জানালার কাছে ! আলোতে তাকে দেখাযেতেই পারে। গুটিয়ে শুয়ে থাকা স্বাভাবিক নয় এও হয়তো বুঝতে পেরেছেন।

যাই হোক সে দেখল, মশারি তুলে, দাদু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। পরে মাথার উপর হাত রেখে গায়িত্রী জপ করলেন। পরে বললেন, নিশ্চিন্তে ঘুমোও। ঈশ্বরের মহিমা সব। দুশ্চিন্তা জীবনের আর এক মারাত্মক ব্যাধি। সবই তার ইচ্ছে ভেবে নাও। আমরা কুটো গাছটিও তাঁর মহিমা ছাড়া নাড়তে পারি না। বুঝলে কিছু !

সে সাড়া দিল না।
লজ্জা সংকোচ সব মিলে তাকে কাবু করে ফেলেছে।
তার ভাল করে দাড়িগোঁফও গজায়নি। সামান্য নরম উলের মতো আবছা অদৃশ্য পুরুষ মুখের অবয়বে মাঝে মাঝে টের পায়। কিন্তু তার পরিণাম শেষপর্যন্ত এই, জানবে কী করে!
সে ভয়ে আতঙ্কে গুটিয়ে যাচ্ছিল—আর এ-সময় দাদু ফের বললেন, মনে মনে গায়িত্রী জপ করে। কু-চিন্তা কর না। একাগ্র হও। নিমগ্ন হও। যেন মন্ত্রের মতো কথাগুলি উচ্চারণ করে চলেছেন।
তার ভয় ভীতি কমে আসছে।
পাশ ফিরে শুল। গায়িত্রী জপ করল। একাগ্র হবার চেষ্টা করছে। আর বেশি মেলামেশা যেন ঠিক হবে না লাবণ্যর সঙ্গে। মেলামেশা করলেই কু-চিন্তা।
সে ঘুমিয়ে পড়ল।
সকালে ঘুম ভাঙলে তার ত্রাস।
কিছু হয়ে যায়নি তো!
সে দেখল, না কোথাও দাগ লেগে নেই। মাড় দেওয়া শক্ত খোলের মতো প্যান্টের আংশিক কোনো জায়গাও শক্ত হয়ে গেই। সে কেমন নিষ্কৃতি পেয়ে গেল।
সকালে ঘুম থেকে উঠে নিয়ম গৃহদেবতার দরজায় মাথা ঠোকা। সর্বাগ্রে বাড়ির সবাইকে কাজটি সারতে হয়। ঘুম থেকে উঠেই যে যার মতো মাথা ঠোকে। সেও ঠাকুরঘরের দিকে হেঁটে যেতে থাকল। সূর্য ওঠেনি। কাকপক্ষীরা উড়ে যাচ্ছে। সিমের মাচানে সে একজোড়া ভুফি পাখি দেখেছিল বাসা বেঁধেছে। দাদুও দেখেছেন। দাদুর কড়া নির্দেশ, ওখানে হাত দেবে না। এবং সে টের পায় গ্রীষ্মের কোনো দুপুরে স্ত্রী পাখিটি ডিম পাড়বে। ডিম পাড়ার আগে জোড়ায় ওদের ওড়াউড়ি—এবং কখনও সে টের পায় দুপুরের নিস্তব্ধতা ভেঙে তারা কোথাও থেকে গলা ফুলিয়ে ডেকে যাচ্ছে।
সে পাখিদুটোর কথা ভাবতে গিয়ে দেখল, লাবণ্য হাঁটু গেড়ে ঠাকুর প্রণাম করছে। তারপর দরজায় শেকল খুলে সাঁজি হাতে নিয়ে বের হয়ে আসছে।
সে লাবণ্যর দিকে তাকাবে না, তাকালেই মেয়ে তার রূপলাবণ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এত সুন্দর আর মিষ্টি দেখতে লাবণ্য, যে তাকে পরিহার করে চলাও কঠিন! কিন্তু দাদুর কথাই তার মনে হচ্ছেকেবল, একাগ্র হও। নিমগ্ন হও। কু-চিন্তা কর না।

এ-বয়সে সব তুচ্ছ। বড় হওয়া ছাড়া তার আর কোনো দায় নেই। লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। সে লাবণ্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে শিখুক দাদু হয়ত এমনই চান। না পারলে পড়াশোনায় একাগ্র হতে পারবে না। পড়তে বসলে লাবণ্যর মুখ ভেসে ওঠে। দাদু একাগ্র হও বলতে এমনও বোঝাতে চেয়েছেন হয়ত। দাদু কি তবে টের পেয়ে গেছেন। লাবণ্যই হেতু। সাঁরা মুখে তার রক্তের চাপ বেড়ে গেল।
লাবণ্য তাকাল ট্যারচা চোখে।
বাবুর ঘুম ভেঙেছে। তাকে দেখতেই পাচ্ছেন না! যেন চিনতেও পারছেন না। তাকে দেখলেই বাবুর মুখে প্রসন্নতা বিরাজ করত। আজ তাও নেই। গোমড়া মুখ।
তুমি তবে আমাকে চিনতে পারছ না!
আচ্ছা!
দেখা যাবে?
এইসব ভাবতে ভাবতে লাবণ্য বোধহয় সাঁজি হাতে জবাফুল গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। শ্বেতজবা, রাঙাজবা, ঝুমকোলতা, নীল অপরাজিতা ফুল তুলছে।
শ্বেতজবার ডাল নাগাল পাচ্ছে না। ডালটা টেনে নামাবার চেষ্টা করছে। পারছে না।
অন্যসময় হলে ইন্দ্র নিজেই ছুটে গিয়ে বলত, সর। হয়েছে। বলে সে লাফ দিয়ে ডালের ডগা নুইয়ে ধরত।
বলত, নে পাড়।
আজ কিছু বলছে না। সে ঠাকুরঘর পার হয়ে ঘাটের দিকে গেল। মটকিলার ডাল ভেঙে দাঁতন করল। তার আজ ঠাকুরঘরে কাজ নেই। দাদু কোনো শিষ্য বাড়ি যাবেন না, যজনযাজনেও বের হবেন না। পূজার ঘরে দাদুই ঢোকবেন। এবং লাবণ্য সব যোগাড় করে দেবে।
শুদ্ধ বস্ত্রে লাবণ্য ঠাকুরঘরে ঢোকে।
গায়ে গরদের শাড়ি। ব্লাউজ পরে না তখন। নিয়ম নেই। ঠাকুরের অনিয়ম অনাচার বিন্দুমাত্র দাদু সহ্য করতে পারেন না। তার জন্য সোনামাসি গরদের শাড়ি বের করে রাখেন। কুমারী মেয়ে, শুধু শাড়ি প্যাঁচ দিয়ে পিঠ বুক ঢেকে ঠাকুরঘরে চন্দনবাটা থেকে, নৈবেদ্য সব সাজানোর দায় সে নিজেই হাতে তুলে নিয়েছে।
এ-জন্য লাবণ্যকে অন্য নাতিনাতনিদের চেয়ে তিনি একটু আলাদা চোখে

দেখেন। দাদু যা পছন্দ করেন না, সে তা করে না।

কিন্তু সে যতই লাবণ্যকে এড়িয়ে চলুক, লাবণ্য তাকে যে ছাড়বে না বুঝতে পারল সাঁজবেলায়।

সাঁজবেলায় হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকতেই অবাক। তার তক্তাপোশে হিরণ মঞ্জু। কলের গান। রেকর্ড ঘুরছে। তার পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে কারো যেন মাথায় নেই। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে লাবণ্য রেকর্ড চালিয়ে দিচ্ছে।

কলের গান বাজছে।

আগেও বাজত। তবে সোনামাসির বারান্দায়। পাটি পেতে সবাই ঘিরে বসত। গান শুনতে তারও যে ভাল লাগে সেটা সে বুঝতে দিত না। হিরণ হাত ধরে টেনে এনে জোর করে বসাত। সে দুটো একটা রেকর্ড বাজলেই উঠে যেত।

কিন্তু আজ আশ্চর্য মনে হচ্ছে গানটা—সে যেন এতদিন এতবার শুনেও গানের অর্থ বুঝতে পারেনি।

প্রাণে এক ধূসর ছবির মায়া সৃষ্টি হচ্ছে। দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়ায়—বাজছে রেকর্ড। কার গান সে জানে না। তবু যেন এক দূরের খবর বয়ে আনছে।

সে বুঝতে পারছে না, তার ঘরেই কেন আজ সবাই জোট বেঁধে এমন হাট বসিয়ে দিয়েছে।

লাবণ্য বলল, হিরণ বল না!

দাঁড়া। বলে রেকর্ডটা তুলে সন্তর্পণে ফ্রক দিয়ে মুছল। পিন পালটালো। পরে রেকর্ডে বসিয়ে দিতেই গম গম করে বেজে উঠল—আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে....

আশ্চর্য গভীর সব শব্দমালা নিরন্তর এক জগত সৃষ্টি করে চলেছে। সে পাশে দাঁড়িয়ে শুনছে—তার রাগ ক্ষোভ জ্বালা আর নেই। সে এ-সব গানের শব্দমালায় নতুন ঘ্রাণ আবিষ্কার করে লাবণ্যকে চুরি করে দেখছিল। লাবণ্য আজ এত সেজেছে কেন বুঝছে না। হাতে সোনার বালা, গলায় সীতা হার। কানে ঝুমকো দুল। শাড়ি পরেছে লাবণ্য, তাকে কেমন মা মাসিদের মতো মনে হচ্ছে।

হিরণ রেকর্ড চালিয়ে বলল, বসো. দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। দিদির জন্মদিন। মা ঘর সাজাচ্ছে। রাগ করছ না তো?

জন্মদিন সে আবার কী বস্তু! সোনামাসিকে যত দেখছে, লাবণ্য হিরণকে যত দেখছে, তত সে বুঝতে পারছে সত্যি তারা অন্যগ্রহের বাসিন্দা। জন্মদিনে তবে

খুব সাজতে হয়। লাবণ্য তাই শাড়ি পরেছে। সিল্কের শাড়ি। ঠিক সামলাতে পারছে না। তবু বেশ গাছকোমর করে শাড়ি জড়িয়ে কিছুটা উঠে গেল ভিতরের দিকে। হামাগুড়ি দিয়ে যাবার সময় তার প্রচ্ছন্ন নারী মহিমা এবারে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ইন্দ্র কথা বলতে পারছে না।

এক কোনায় সরে বসল লাবণ্য।

বড়দা, মেজদাও এসেছে। দুই মামী চুপি দিয়ে গেল। রাতে ভাল খাওয়া দাওয়া হবে এও টের পেল। জন্মদিনের উৎসব তবে বাড়িতে। সকালেও জানত না। স্কুল থেকে ফিরে এসে কাছারি বাড়ির মাঠে খেলতে গেছে। তারপর ঘাট থেকেই হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে দেখে এই কাণ্ড।

বিয়ের কনের মতো লাবণ্য আজ সেজেছে। মুখে স্নো পাউডার না মাখলেও হয়, মাখলে ওর সুষমা যে খুব বাড়ে ইন্দ্র তা মনে করে না। লাবণ্য কোনো কথা বলছে না। সকালে সে লাবণ্যকে এড়িয়ে গেছে।

এখন লাবণ্য তাকে যেন এড়িয়ে যাচ্ছে।

হিরণ বলল, বাবা থাকলে দেখতে, বাবা কী সুন্দর আবৃত্তি করে জান। এই দিদি কর না। দিদি বাবার মতো সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে জান!

তাদের স্কুলে তো শুধু বার্ষিক ফুটবল খেলা হয়। আর কিছু তো হয় না। গাঁয়ে বড়দা এসে ক্লাব গড়ে তুলেছে। সেখানেও আবৃত্তি হয় বলে জানে না। তাঁরা ক্লাসে কবিতা মুখস্থ বলে। কোথায় থামতে হবে, কোথায় স্বরের ওঠানামা হবে কোনোদিন মাস্টারমশাই বলে দেননি।

লাবণ্য আবৃত্তি করার সময় উঠে দাঁড়িয়েছিল।

তার নিজেরই কেমন লজ্জা লাগছে। যাত্রাগানে সীতার বনবাসের মতো, হায় রাম, কোথা রাম, অযোধ্যা নগরীর দশরথ-পুত্র তুমি— সেই বিলাপের মতো কিছুটা। তার হাসি পাচ্ছিল। কারণ লাবণ্য কারো দিকে তাকাচ্ছে না। সে যেন দূরের কোনো ছবি দেখতে দেখতে উচ্চারণ করে চলেছে— দেবতার গ্রাস রচনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপর শুরু— গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে— মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে—

শুনতে শুনতে ইন্দ্র বুঝল, না লাবণ্য সত্যি দূরের। সে কাছে এলে তাকে এড়ানো কঠিন।

তারপর হাততালি। সেও হাততালি দিল। লাবণ্য বসে পড়ে বলল, ধুস কিছু হয়নি। খুব বাজে। বলে লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে পড়ল।

লাবণ্যর এমন নম্র সলজ্জ মুখ দেখে সে কেন যে চোখের জলে ভেসে গেল বুঝল না। দৌড়ে ঘর থেকে পালাল নিজের এই বোকামির জন্য।

বাইরে ছুটে গিয়ে উঠোনে দাঁড়াতেই শুনল, হিরণ ডাকছে, ও ইন্দ্রদা আমাদের ফাংশান শেষ হয়নি।

সে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশে সেই আমলকি গাছের ছায়া। তেতুল পাতার মতো চিকরি পাতা। গাছটা তাকে নানা সময়ে আড়াল করে রাখে।

সে ভেবে পেল না চোখে জল এসে গেল কেন।

আনন্দে, না ঘোরে! না লাবণ্যর চোখ জলে ভার হয়ে উঠেছিল বলে।— শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছে দেবতা, শোননি কি জননীর অন্তরের ব্যথা!

শোননি কি জননীর অন্তরের ব্যথা! সে কেমন মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করছিল। পাঠ্য বই-এর বাইরে সে কোনো কবিতা পড়েনি। কলের গান শুনেছে, বাড়িতে না। বর্ষায় সারা মাঠ ঘাট নদী নালা ভরে গেলে, নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দূরে নৌকায় কলের গান। এক রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি হত তার। জলের উপর দিয়ে শব্দ তরঙ্গমালা বিস্ময়ের স্মৃতি পার হয়ে আপন অন্তরে উদ্ভাসিত হত। মাথায় তার দু-হাত যেন সে দিনদিন যত বড় হয়ে উঠছে তত নানা ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। নিরুদ্দেশ বালকের মতো নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই অন্তহীন বালকের ছবি কত দূরে ফেলে এসেছে। যেন স্বপ্ন এবং সৌন্দর্য দুই তার কাছে অতি প্রিয় ছিল।

॥ ছয় ॥

সেদিন তার কাছে ফাংশানও বড় নতুন কথা। সামান্য ক'জন বালক বালিকা, কলের গান, আবৃত্তি, তারপর হিরণ নিজে গাইল— দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়ায়...

যেন সে এতদিন দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। লাবণ্য এসে তাকে জাগিয়ে দিল। ঘোমটা পরা ঐ ছায়ায় ভাবতেই আমলকি গাছটা চোখে ভেসে উঠল। ফাংশান, জন্মদিন, আবৃত্তি, কলের গান এবং লাবণ্য তাকে যেন বলছে, বিকশিত হও। ঠাকুরদার আপ্তবাক্য, লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। দেড়ক্রোশ রাস্তা হেঁটে স্কুল, ফিরে আসা, প্রকৃতির শীত গ্রীষ্মের ছবি, বর্ষার সাপলা ফুল, জলজ ঘাস এবং ঘন জঙ্গল ভর্তি গ্রাম্য বালক ইন্দ্র লাবণ্যরা না এলে সুদূরের খবরই পেত না। তার এতদূর হেঁটে আসা আর ক্রমান্বয় হেঁটে

যাওয়া যেন শুধু কোনো প্রিয় নারীর অন্বেষণে।

এই প্রিয় নারী নানাভাবে আজকাল দেখা দেয়। কখনও সে ব্যালকনিতে বসে আছে। পাশে লাবণ্য। দু'জনই সমুদ্র দেখতে এসে কোনো হোটেলে যেন উঠেছে। শীতের হাওয়া। লাবণ্য সব বুঝি টের পায়। সে দেখতে পেত, লাবণ্য শীতের র‍্যাপার এনে তার গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে।

কিংবা লাবণ্য তার পেছনে দাঁড়িয়ে, সমুদ্রের ঢেউ দেখছে।

কখনও নারী তার শিয়রে বসে থাকে। কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। কোনো নির্জর প্রান্তরে সে দেখতে পায় লাবণ্য আর সে ছুটছে। অঝোরে বৃষ্টিপাত ঝড়ো হাওয়া, যেন লাবণ্য বলছে এস, ছুটে এস। পারছ না। হাত ধর। লাবণ্যর চুল, আঁচল ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে। লাবণ্যর শাড়ি বৃষ্টিপাতে ভিজে গেছে। শীতের হাওয়ায় দু'জনেরই বড় উষ্ণতার দরকার। সে বোঝে তার এই উষ্ণতার মূলে সেই নারী। তার যা কিছু, এবং অপেক্ষা কোনো নারীই হেতু।

চিঠি পেয়ে সে আসলে তারই খোঁজে যাচ্ছে।

কোনো অপেক্ষা নেই বলেই একটা মেসবাড়িতে পড়ে থাকে। অপেক্ষা নেই বলে, মেসে ফেরার আগ্রহ থাকে না। তবু ফেরে। অর্থহীন মনে হয়— ইচ্ছে করলে সে সুন্দর ফ্ল্যাটে সাজিয়ে গুছিয়ে বসতে পারত। বাজার করত। সকালে লাবণ্য হাত মুছে যদি বলত, এই নাও ফর্দ। সিঁড়ি ধরে নামছে, হঠাৎ কানে আসছে, শুনছ! সে সিঁড়ির মুখে দেখতে পাচ্ছে লাবণ্য দাঁড়িয়ে— কালজিরে এন। ভুলে যেও না।

একা মেসবাড়িতে শুয়ে সকালে এমন সব ইচ্ছের অবকাশ চোখে ভেসে ওঠে। —কি, তোমার চান হল না! তাড়াতাড়ি কর। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এটা পর। তোমাকে খুব মানায়। সে চিরুনিতে মাথা আঁচড়ায়, মনে হয় লাবণ্য তার ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মারছে। কখনও শিশুর মতো আদর খাচ্ছে।

কিন্তু সহসা তার সব চিন্তা ভাবনা অতর্কিতে কেউ ভেঙে দিয়ে বলে, ফোন! হ্যালো। হ্যাঁ— শোনো, রাইটার্সে যাবে। নেহরু আসছেন। সারাদিন তাঁর কনভয়ের সঙ্গে ঘুরবে। সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে। তার তখন দ্রুত কাজ করার অভ্যাস। সে বড় অলীক চিন্তাভাবনায় ডুবে যায়। দাঙ্গা দুর্ভিক্ষ দেশভাগে সব ছত্রভঙ্গ। কে কোথায় যে ছিটকে পড়ল!

ট্রেনটা ফের নড়ে উঠল।

যত ট্রেনটা এগোচ্ছে— তার কেন যে মনে হচ্ছে, আসলে এই চিঠি তার কুহক। অন্য কোনো হিরণের চিঠি। সেই হিরণ নেই, লাবণ্য নেই। এরা অন্য

কোনো হিরণ, লাবণ্য। এতটা কুহকে পড়ে যাওয়া বোকামি। এ-ভাবে ট্রেনে উঠে পড়াও বোকামি। পকেটে চিঠি হাতড়াল। যে হিরণ-লাবণ্যই হোক চিঠিটার শেষ দেখবে।

কুহকে পড়ে না গেলে কেউ এ-ভাবে বুঁদ হয়ে থাকতে পারে! যেন শৈশব কৈশোর তার স্মৃতির অলিগলিতে মগজের লক্ষ কোটি কোষে উপদ্রব শুরু করে দিয়েছে। বিশ্ব সংসারে এতক্ষণ তারা ছাড়া আর তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সে জীবনে পোড় খাওয়া মানুষ। হতাশা কত মারাত্মক রূপ নিতে পারে লাবণ্যরা যুদ্ধ শেষে চলে যাবার পর হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল।

সে একা ঘুরত ফিরত। কারো সঙ্গে কথা বলতে পারত না। বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকল। কিছু ভাল লাগছে না। মা কেমন ভয় পেয়ে বলেছিল, তুই কেমন হয়ে গেছিস। সামনে তোর পরীক্ষা। কারো সঙ্গে কথা বলিস না; কথা বললে সাড়া পাওয়া যায় না।

সে কথা বলবে কি! কথা বললেই তার গলা ভারি হয়ে উঠত। যেন তার সর্বস্ব অপহরণ করে লাবণ্য স্টিমারে উঠে গেল।

যতদূর চোখ যায়, লাবণ্য রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়েছিল। যতদূর চোখ যায়, দেখেছে, রেলিং-এ লাবণ্য হাত নাড়ছে। হিরণকে দেখতে পাচ্ছিল না। সে নদীর পাড়ে যতটা পেরেছে হেঁটেছে। যতটুকু তার সান্নিধ্য পাওয়া যায়। সে শেষে দেখেছিল, নদীর বাঁকে স্টিমার অদৃশ্য হয়ে গেছে। নদীর জলে শেষ তরঙ্গও মুছে গেল। সে, হরেনদা গেছিল স্টিমার ঘাটে। দাদু বেঁচে নেই। দাদু তার জীবনে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল। লাবণ্য তার সবটা।

যাবার সময় লাবণ্য একান্তে ডেকে বলেছিল, প্রমিজ।

কি প্রমিজ!

প্রমিজ চিঠি দেবে!

দেব।

কিন্তু সে লাবণ্যর কথা রাখতে পারেনি। একজন কিশোরের পক্ষে কোনো কিশোরীকে চিঠি দেওয়া কতটা দৃষ্টিকটু পরে টের পেয়েছিল। মেসো, মাসি কিছু ভাবতে পারে। লাবণ্য যদি চিঠিটা দেখায়, কিংবা মেসো মাসির হাতে পড়ে. লাবণ্যকে কে চিঠি দিল! এমন কৌতূহল যে মেসো-মাসির থাকবে না হতে পারে না। চিঠিটাতে সে তো বার বার একটা কথাই লিখতে চেয়েছে, তোমরা চলে যাবার পর আমার কিছু ভাল লাগছে না। ভাবছি বাড়ি ফিরে যাব। পড়াশোনায় মন দিতে পারছি না। কিন্তু লিখে কেটে দিয়েছে। সম্বোধন করবে

কি ভাবে! পরম কল্যাণীয়া— বুড়ো বুড়ো গন্ধ। লাবণ্য তোমার ব্যাসিনজারের খবর কি! সে কি আমার মতো কোনো উৎপাত করে। না ঠিক হল না। আমার মতো উৎপাত করে মানে! সোনামাসি অন্যরকম ভাবলে, সে ছোট হয়ে যাবে। লাবণ্য ছোট হয়ে যাবে।

লাবণ্য বলেছিল, প্রমিজ।

কী প্রমিজ!

লাবণ্য তাকে যাবার দিন স্টিমারঘাটে সবার সামনে গড় হয়ে প্রণাম করেছিল। তারপর সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল অন্যদিকে।

ইন্দ্র ডাকছিল, এই শোন।

লাবণ্য মুখ না ফিরিয়ে বলেছিল, বল।

তোদের অমলপুর জায়গাটা ভাল, না, এখানটা ভাল।

লাবণ্য বলেছিল, জানি না।

জানি না কিরে। এত কথা অমলপুরের। বাড়ির সামনে বাগান— পেছনে পাহাড়, উপরে মন্দির। তুই গিয়ে মন্দিরে বসে থাকবি, কী হাওয়া, দূরে পাহাড় জঙ্গল, মানুষের ঘর বাড়ি, কত সব আশ্চর্য খবর দিতিস! এখন বলছিস জানি না!

তখনই দেখল আঁচলে মুখ ঢাকল লাবণ্য।

যা, তুমি না, সত্যি!

আর তখনই ফের সেই কথা।

প্রমিজ!

কি প্রমিজ।

প্রমিজ, তুমি বুড়ো হবে না।

এ আবার কেমন কথা। সবাইকে একদিন বুড়ো হতে হয়। লাবণ্য কী ভেবে কথাটা বলেছিল সে জানে না।

সে তো এখন উত্তর ত্রিশের যুবক। সে তো বয়স বাড়লে একদিন বুড়ো হবেই। কে হয় না। কে আছে এমন! তবু লাবণ্যর ছেলেমানুষী জেদ।

কী বললে না তো!

কী বলব!

তুমি বুড়ো হবে না। তোমার কোনো শীতকাল থাকবে না।

যা তুই না সত্যি... আর বলতে পারেনি। বললে শোনাতো পাগলা আছিস।

কিন্তু বিদায় মুহূর্তে সে লাবণ্যকে চটিয়ে দিতে চায়নি। লাবণ্য পরেছিল

ঢাকাই জামদানি শাড়ি। খোঁপা উঁচু করে বাঁধা। সাদা ঝিনুকের কারুকাজ করা ক্লিপ আঁটা। বালিকা লাবণ্য কিশোরী হয়ে ফিরছে। তিন চার বছরে লাবণ্য অনেক কিছু বুঝতে শিখে গেছে। সেও। লাবণ্য না থাকলে এত তাড়াতাড়ি বোধ হয় সে সব কিছু টের পেত না।

সে না থাকলে লাবণ্যও বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেত না।

লাবণ্য এক বিকেলে চুপি চুপি তার ঘরে ঢুকে বলেছিল, এই ইন্দ্রদা। কী কেবল ঘুমোচ্ছ। ওঠো।

সে উঠে বসলে দেখল লাবণ্য একটা কাসকেট নিয়ে এসেছে। সবাই ঘুমিয়ে আছে। দিবানিদ্রার ঘোর চলছে বাড়িটাতে। এমন সুন্দর কাসকেট নিয়ে নির্জন বিকেলে ঘরে ঢুকে যাওয়ায় সে খুব স্বস্তিতে ছিল না।

কাসকেটে কি আছে!

আর এত জোরে নিশ্বাসই বা পড়ছে কেন লাবণ্যর!

লাবণ্য কাসকেটটা ফ্রকের নিচে সন্তর্পণে বের করে উঁকি দিয়ে কি দেখল!

মেলায় গিয়েছিল, এমন একটা নির্জন পৃথিবীতে নানা পালা-পার্বন লেগেই থাকে। মেলা, বান্নি, ঝুলন, যাত্রাগান গ্রাম জীবনে নানা মোহ সৃষ্টি করে থাকে। নাঙ্গলবন্দের বান্নির অষ্টমী স্নানে নৌকায় করে গিয়েছিল তারা। নদীর পাড় ধরে হাজার হাজার পুণ্যার্থী। পক্ষকাল ধরে মেলা। ঘাটে ঘাটে অজস্র নৌকা। দূরে ললিত সাধুর আশ্রম। ভৈরব ঠাকুরের মন্দির। চামুণ্ডার থান, এবং নানা কিসিমের দেবদেবীর পূজা পাঠ। আর সকালে ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুব দিয়ে স্নান— কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা, এমন সব মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে ফুল বেলপাতার ছড়াছড়ি জলে— নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে। লাবণ্যর কী যে মাথা খারাপ! সেও জলে নেমে ডুব দিয়েছিল। তাকেও জোর করে জলে টেনে নামিয়েছে। পুরোহিতের কাছ থেকে ফুল বেলপাতা চেয়ে নিয়ে মন্ত্রপাঠ করেছে। সূর্য প্রণাম করেছে। লাবণ্যর পাশে সেও দাঁড়িয়েছিল। লাবণ্যর সঙ্গে সেও মন্ত্রপাঠ করেছে। সূর্য প্রণাম করেছে একসঙ্গে। নদীর জলে ডুব দিয়েছে। তামার পয়সা, তিল তুলসি নদীর জলে ছুঁড়ে দিয়ে দু'জনের জন্য কল্যাণ কামনা করেছে।

তেমাল্লা নৌকা। বিশাল নৌকায় তারা ঘাট থেকে রাতে উঠেছে। ভোর রাতে নৌকা ললিত সাধুর আশ্রম পার হয়ে নোঙর ফেলেছে। যোগ স্নান। দুই দিদিমা, দাদু, সোনামাসি, হিরণ, লাবণ্য, বড়মামী, মঞ্জু সবাই এসেছে যোগস্নানে। স্নানের শেষে যে যার মতো জিলিপির দোকান, ভাজাভুজির দোকানে ঘুরে

বেড়িয়েছে সার্কাস দেখেছে বিকেলবেলায়। রাতে নৌকায় রান্না। নতুন মেটে হাঁড়িতে ভাত, ইলিশের ঝোল। কলাপাতায় রাতে নৌকার পাটাতনে বসে খাওয়ার মজা।

সার্কাস দেখে ফেরার সময় একটা তাঁবুর মধ্যে লোক ঢুকে যাচ্ছে দেখেই লাবণ্য বলেছিল, ওখানে কি হচ্ছে ইন্দ্রদা

ছবি তুলছে।

যাবে! ছবি তুলব।

এখনই ছবি তুলবি কি। সবার সঙ্গে ছবি তুলতে হয়। মাসিকে বলব। সে লাবণ্যকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় ছবি তুলতেও সাহস পায়নি।

লাবণ্যই খবর দিয়েছিল সোনামাসিকে। খুবই সুযোগ পাওয়া গেছে। মেলায় ছবি তোলারও ব্যবস্থা আছে। মেলাটা দীর্ঘ দু-মাইল জুড়ে— নদীর পাড়ে পাড়ে— বাইস্কোপ পর্যন্ত এসেছে। চণ্ডিদাস। সোনামাসি টিকিট কেটে এনেছে। বটার জটা পার হয়ে বাইস্কোপের তাঁবু। সোনামাসি মেলায় আরও এসেছে। সব চেনা তার। লাবণ্যকে নিয়ে ইন্দ্র ঘুরত। তিলা কদমা, মুড়ি, খই, বাতাসা— মিষ্টির দোকান, কাঁচের চুড়ি, তামার বাসন, মালা তাবিজ, ঝিনুকের নৌকা এবং হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ভিড়ে হারিয়ে যাবার ভয়। মেলায় ঢুকলেই লাবণ্যর এককথা, আমার হাত ধর। ভয় করে।

ভিড়ের মধ্যে হাত ধরে হাঁটা যায় না। ইন্দ্র পাত্তা দিত না। বলত, আয় না। হারিয়ে যাবি কেন। বটার জটা বললেই সবাই ঘাটটা দেখিয়ে দেবে। তবে এত নৌকা, যে ঘাটে লাগানো যায় না। তাদের নৌকাও ঘাটে ভেড়ানো যায়নি। একটা তালের নৌকা দুটো কাঁঠালের নৌকা সামনে। তিনটে নৌকা পার হয়ে তাদের নৌকাটা। মনমোহন কর্তার বাড়ির মানুষজন বলেই, যখন তখন দু-তিনটা নৌকা লাফিয়ে তাদের নৌকায় উঠে যেতে পারত। আর সামনে নদীর জলরাশি। ও-পাড় দেখা যায় না। নদী যেন অনন্ত উৎস থেকে নেমে এসেছে। জ্যোৎস্না উঠলে ছই-এর উপর বসে থাকা, দিদিমার শঙ্খকুমারের প্রস্তাব— ছই-এর ভিতর অস্পষ্ট হারিকেনের আলো, সঙ্গে লাবণ্য— মেলাটা নানা কারণে ইন্দ্রকে যেন আলাদা আকর্ষণে ফেলে দিয়েছে। লাবণ্যকে সে একটা ঝিনুকের নৌকা কিনে দিয়েছিল।

মেলায় তারা তেরাত্র বাস করেছিল।

দাদুর বিশ্বাস, যে কোনো তীর্থক্ষেত্রেই তেরাত্র বাস না করলে পুণ্য হয় না।

সকালে সে দাদুর সঙ্গে বাজারে যেত। জেলেদের ঘাটে যেত মাছ আনতে।

আনাজপাতির বাজার লক্ষ্মণ সাধুর আশ্রমের পাশে। বড় টাকচাঁদা মাছ তাজা, বাচা মাছ নদীর, কখনও ইলিশ, একেবারে জাল থেকে তোলা— লাবন্য পাড়ে দাঁড়িয়ে লাফাত। তাজা মাছ দেখলে লাবণ্য হাহা করে হাঁটুজলে নেমে আসত— উবু হয়ে বসে ঝুড়িতে মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করত— তখন মনেই হত না, এই সেই লাবণ্য যার জন্মদিন পালন করা হয়, যার ব্যাসিনজার বলে বাঘের মতো কুকুর আছে। যে কথায় কথায় বলে, প্রমিজ।

মাসি সবাইকে নিয়ে গ্রুপ ফটো তোলার সময় সে দেখেছে, ঠিক তার পাশে লাবণ্য। সাত কপির অর্ডার। কিন্তু লাবণ্য বলল, আমার আলাদা এক কপি চাই। সোনামাসি জানে, লাবণ্যর নিজস্ব অ্যালবাম আছে। কি ভেবে আর এক কপির বেশি অর্ডার দিয়ে দিল।

লাবণ্য ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। কাসকেটটা হাতছাড়া করছে না। এত সাহস মেয়েটার! সে বুঝতেও পারছে না— কেন লুকিয়ে তার ঘরে লাবণ্য এসেছে! দরজা ভেজিয়ে না দিলে তার এমন মনে হত না।

সে নিজে এবার তক্তপোষ থেকে নেমে গেল। দরজা খুলে দিয়ে বলল, তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তুই কিরে!

সে তক্তপোষে বসলে লাবণ্য উঠে গিয়ে ফের দরজা ভেজিয়ে দিল।

কেউ এসে গেলে কী যে হবে! ওর মুখ শুকনো হয়ে যেতেই লাবণ্য হা হা করে হেসে ফেলল।

তুমি এত ভীতু!

সে কেমন কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, তুই বুঝিস না!

খুউব বুঝি! শোনো। ফিসফিস গলায় বলল। সামনে এসে বস। তার গলা বুক শুকিয়ে উঠছিল। সামনে এসে বস মানে! বলে জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে কাসকেট খুলে দেখাল। অ কাসকেট! আর কিছু খুলে দেখাচ্ছে না। রক্ষা! যা মেয়ে! দেখাচ্ছে তার প্রিয় অ্যালবাম। এতে এত গোপন কি থাকতে পারে ইন্দ্র বুঝতে পারল না। অ্যালবামের পাতা উল্টে গেল।

আমাদের বাংলো।

বাংলোটা সত্যি সুন্দর। এই প্রথম লাবণ্য বিশ্বাস করে যেন তার অ্যালবামটা দেখাল। সে সহজে কাউকে দেয় না। দেখায় না। হাতছাড়া করে না। প্রিয়জন ছাড়া তার অ্যালবাম কেউ ধরতে পারে না। ইন্দ্রকে দিয়ে বলল, খোলো না! অ্যালবাম দিয়ে শুরু।

অমলপুরের রাস্তা।

ব্যাসিনজার।

বাব্বা! এই তোর ব্যাসিনজার! এ তো মানুষ খেয়ে ফেলতে পারে। হা হা করছে। জিভ বের হয়ে আছে। ছবিটা এত জ্যান্ত যে মনে হয় হাত দিলেই কামড়ে দেবে।

লাবণ্য ব্যাসিনজারকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে। কুকুরটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে লাবণ্যকে। গাছের নিচে লাবণ্য-ব্যাসিনজার। বারান্দার ইজিচেয়ারে লাবণ্য শুয়ে আছে, কুকুরটা শুয়ে আছে পায়ের নিচে। পর পর ছবি উল্টে যাচ্ছিল লাবণ্য।

বাংলো বাড়ির কোথায় কে থাকে আঙুল দিয়ে তাও দেখিয়ে দিল। বিরাট চৌচালা ঘর। ছবি দেখে ঠিক বোঝা যায় না। বলল, জান, ঢুকেই আমাদের পার্লার। ডানদিকের ঘরটায় বাবা-মা থাকেন। পিছনে করিডোর ধরে গেলে আর একটা বড় ঘর গেস্টদের জন্য। এদিকের ঘরটায় আমরা থাকি— পিছনে টয়লেট, প্যানট্রি। সেগুন কাঠের পাটাতন। লাল নীল রঙের জানালা দরজা। বাড়িটা দূর থেকে মিকি মাউসের মতো দেখতে।

টয়লেট মানে! মিকি-মাউস মানে! লাবণ্য কত কিছু জানে!

লাবণ্য কি বুঝল কে জানে—অথবা লাবণ্য এই গ্রাম্য কিশোরকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যই বলতে পারে, টয়লেট। টয়লেট জান না! তুমি কি!

আসলে মলমূত্র ত্যাগের ঘরটি যে শুধু বাথরুম পায়খানা নয়, তার সঙ্গে সাজগোজ করার, জামা প্যান্ট পাল্টাবারও ব্যবস্থা থাকে টয়লেটে—অন্তত লাবণ্যদের বোধ হয় তাই ছিল, যে কোনো কারণেই হোক টয়লেট সম্পর্কে আর একটা কথাও বলল না। অন্য যে কোনো কথায় যেন এক অদৃশ্য কুৎসিত ছবি ফুটে উঠতে পারে। ইন্দ্রদার মতো মানুষের কাছে অন্য যে কোনো ভাবেই কথাটা বললে— সে বুঝি লজ্জায় পড়ে যাবে। তারপরই বলল। এটা আমাদের পড়ার ঘর। সুকুমারবাবু রোজ আমাদের পড়াতে আসেন। মা তাকে রোজ দুটো রসগোল্লা দেয়। সুকুমারবাবু জান, রসগোল্লা খেয়ে না, প্লেটটা জিভ দিয়ে চাটত। আমার খুব হাসি পেত। রসগোল্লা এলেই আমি টয়লেটের নাম করে বের হয়ে আসতাম। শত হলেও মাস্টারমশাই। হেসে দিলে অন্যায় না!

পরের ছবিটা, হাতে বল। লাবণ্য বলটা ছোঁড়ার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। পরের ছবিটা, বলটা মুখে নিয়ে কুকুরটা দৌড়ের ভঙ্গীতে। আর একটা ছবি। মেসো মাসির মাঝখানে লাবণ্য। মেসোর পোষাক সাহেবদের মতো। মাসির মাথায় বড় খোঁপা। ঘোমটা নেই। পরের ছবিটা লাবণ্য এবং হিরণের। দুই বোন

ফ্রক গায়ে দাঁড়িয়ে। পায়ে জুতো মোজা। চুলে দু-বিনুনি।

আবার একটা ছবি উল্টে দেখাল। লাবণ্য একটা পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটা নেই।

সব ছবিতেই সে একা থাকলে, ব্যাসিনজার থাকে।

ইন্দ্র বলল, কিরে তুই একা।

ছোটকাকাকে বললাম, এখন তুলো না, ব্যাসিনজার আসুক। না শুনল না। একা কারো ভাল লাগে বল!

ব্যাসিনজার কোথায় ছিল!

বাবার অফিসে। ওর তো অনেক কাজ। আমাদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, বাবাকে। বাবার ফেরবার সময় হলেই মা ওকে ছেড়ে দিত। সে ঠিক যেত। বাবার সঙ্গে ফিরত। একবার জান, বলেই একটা ছবি দেখাল। ওর বাবার হাতে বন্দুক। পরের ছবিটা ব্যাসিনজার জলে সাঁতরাচ্ছে।

এটা না নীলগঞ্জের ঝিল। বাবা শিকারে গেলে আমাদের সঙ্গে নিতেন। একবার জান এতবড় একটা হরিণ— ওরে বাপস— কি গন্ধ। ওটাকে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হল। প্রতিবেশীদের সবাইকে ডেকে দিলেন। মা-র এক কথা, ও মাংস কেউ খাবে না। তোমার মায়া দয়া নেই! মৃত হরিণের ছবিটাও অ্যালবামে রেখেছে লাবণ্য। এটা না রাখলে পারত। কেন যে রাখল!

লাবণ্য বলল, ছুটির দিনে একা একা বাবা কী করবেন বল! মাছ ধরা, না হয় আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া। আমরা ট্রেনে চড়ে জেঠার বাড়ি যেতাম। নয় শিকারে। আমাদের বাড়িটার জান চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া। রাতের পাহারাদার রেইসিং। ওর কোমরে কুকড়ি থাকবেই। শোবার সময় ছাড়া ও কুকড়িটা কোমর থেকে খুলত না। বাবার খুব বিশ্বস্ত লোক।

কিন্তু রেইসিং-এর কোনো ছবি নেই। মৃত হরিণের ছবি রেখেছে, অথচ রেইসিং নেই। এটা বোধ হয় রেখেছে তার বাবা কত বড় শিকারী বোঝানোর জন্য। কিন্তু তারপরই অ্যালবামটা হঠাৎ চেপে ধরল লাবণ্য।

না, আর কিছু নেই। আর দেখতে হবে না। কেমন লজ্জায় পড়ে গেছে লাবণ্য।

আরে দেখি না।

না না। প্লিজ!

কার ছবি! আমাকে দেখালে কি হবে! এত লজ্জা তোর!

ইন্দ্র অ্যালবামটা টানছে। লাবণ্য দু-হাতে চেপে রেখেছে। কিন্তু জোরে

টানতে পারছে না। ছিঁড়ে গেলে কেলেঙ্কারি। তা-ছাড়া সে তো বাড়িতে বড়মামীর গলগ্রহ। একটু খুঁত পেলেই রণচণ্ডী। কী নিয়ে বেঁধে যাবে— আর দাদু পড়ে যাবেন মহাফাঁপড়ে— এত সব চিন্তা তাকে কিছুটা নিস্তেজ করে রেখেছিল। লাবণ্যর অ্যালবামে এত কি গোপন খবর আছে যে সে তাকে দিতে পারে না। তার আগ্রহ দেখার। কিন্তু লাবণ্য নাছোড়বান্দা। হাত চেপেই রেখেছে।

ইন্দ্র কিছুটা ক্ষোভের গলায় বলল, ঠিক আছে দেখব না। যা।

কিন্তু লাবণ্য গেল না।

লাবণ্য হাত তুলে বসে আছে।

মহাজ্বালা। সোনামাসি নির্জন বিকেলে তার ঘরে লাবণ্যকে আবিষ্কার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। ঘরটা ইন্দ্রর একার না। ছোটদাদু থাকেন, হরেনদা থাকে। এখন নেই। দু-জনেই জমির চাষ আবাদ দেখতে বের হয়েছেন। ঘরটা রাস্তার পাশে। জানালা দরজা খোলা। সমবয়সীরা একসঙ্গে খেলবে, ঘুরবে, বেড়াবে— এতে মানসিক সংকীর্ণতা কমে— এবং স্বাধীনতা না দিলে আত্মপ্রকাশে বিঘ্ন ঘটে এতটা পর্যন্ত ভাবেন বলেই, লাবণ্যর একা ইন্দ্রর ঘরে ঢুকে যাওয়া দৃষ্টিকটু ঠেকবে না। যিনি মুখিয়ে আছেন, তিনি বড়মামী। কি করে যে অদ্ভুত সব খুঁত ধরে ফেলে তার মাথায় আসে না।

কিরে বসে থাকলি কেন। যাবি, না যাবি না। আমি ঘুমোব। দিলি তো কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে। সব দেখালি, শেষটা দেখালি না।

আমি কি বারণ করেছি?

করিসনি! হাত চেপে রাখলি।

হাত চেপে রেখেছি, বেশ করেছি। জোর করে নিতে শেখনি তার আবার এত কথা।

যা বাব্বা। ইন্দ্র সত্যি বোকা হয়ে গেল কেমন। বালকের মতো অ্যালবামটা তুলে নিল।

লাবণ্য আর তাকাচ্ছে না। জানালায় চোখ। কী যেন ভাবছে? কিছুটা যেন অপরাধের চিহ্ন ধরা পড়ছে চোখে মুখে। যেন অ্যালবামটা নিয়ে এই ঘরে তার ঢোকা উচিত হয়নি। অথবা যে আগ্রহ থেকে আসা, তাই সে দেখাতে পারছে না বলে কষ্ট।

অঃ এই। বা দারুণ।

ইন্দ্র দেখছে ছবিটা। পাশাপাশি সে আর লাবণ্য। গ্রুপ ফটোটা রাখেনি। ওটা

থেকে কেটে তার আর লাবণ্যর ছবি আলাদা করে নিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, খুব সতর্ক কাটার সময়। এতটুকু ত্যারচা বাঁকা কাটেনি। চৌকোনো ছবিটা দেখলে মনে হবে তারা আলাদা দু-জনে গোপনে ছবি তুলেছে। ছবিটা এত মহার্ঘ সে জানবে কী করে! কিংবা এতে কিছুটা অপরাধবোধও কাজ করে থাকতে পারে। সে যাই হোক লজ্জায় সংকোচে অ্যালবামটা চেপে রেখেছিল লাবণ্য। আসলে এই ছবিটা দেখাতেই সে গোপনে তার ঘরে ঢুকে গেছে।

ইন্দ্র কেমন মুহ্যমান হয়ে যাচ্ছিল।

ইন্দ্র দেখল ছবিটার চারপাশে রঙিন পেনসিলে ফুল লতাপাতার গাছ তুলে দিয়েছে লাবণ্য। একটা গাছ, একটা লতা। গাছটায় লতাটা জড়িয়ে আছে ছবির চারপাশ। অপরাজিতা ফুলের ছবি, ফুলের লতা আঁকতে চেয়েছে লাবণ্য। কাঞ্চন ফুলের গাছ। সঙ্গে বিন্দু বিন্দু সাদা ফুল। পাশে বিন্দু বিন্দু নীল অপরাজিতা।

সে একবার ছবিটা দেখছিল, একবার লাবণ্যকে দেখছিল। লাবণ্যর চোখে আশ্চর্য নিপুণ নিরাভরণ বর্ণমালা— যার ভাষা নেই কিংবা কোন ব্যাখ্যা নেই। এমন সপ্রতিভ সতেজ চোখ, যেন দুধের ভিতর দুটো বেথুন ফলের ভেসে থাকার স্বপ্ন।

লাবণ্যকে বলল, গ্রুপ ফটো থেকে কেটে করেছিস। সোনামাসি টের পেলে খারাপ ভাবতে পারে।

কি খারাপ ভাববে!

ভাববে তুই স্বার্থপর। তোর সঙ্গে আমি ছাড়া আর কারো ছবি থাকে চাস না।

চাইনা তো!

সোনামাসি, হিরণ, ছোটদাদুতো দোষ করেনি।

আরে দোষের কি দেখলে বুঝি না! আমার ভাল লাগার মন্দ লাগার দাম দেব না! তুমি না দিতে পার, আমি দেব। তাতে কে কি ভাবল আসে যায় না।

আসে যায় না তো ধরা পড়ে যাবি বলে টানাটানি করছিলি কেন?

কী ধরা পড়ব বলছ, বুঝিয়ে বল।

অত বুঝিয়ে তোকে বলতে পারব না। তবে তুই স্বার্থপর, যেই ছবিটা দেখবে ভাববে।

স্বার্থপর কে নয়! তুমি নও। নিজের সুনাম নষ্ট হবার ভয়ে একসঙ্গে ছবি তুলতে রাজি হলে না। কী ভীতুরে বাবা!

ঠিক আছে যা। দেখলাম তো!

কি দেখলে!

যাবি না কেবল কথা বাড়াবি! কি দেখব আবার! ছবি দেখলাম। কাঞ্চন ফুলের গাছ দেখলাম। তোর তো দেখছি গুণের শেষ নেই। দারুণ এঁকেছিস!

সত্যি সুন্দর বলছ।

খুব সুন্দর।

কিন্তু জান ইন্দ্রদা, আমি তো মরে যাব।

মরে যাবি মানে!

অ জান না তুমি! আমার কুষ্ঠিতে নাকি ফাঁড়া আছে। জীবন সংশয় আছে। গ্রহফের ভাল না। ঠিক বাইশ বছর বয়সের পর নাকি হাতেও আয়ুরেখা শেষ।

কুষ্ঠি ঠিকুজিতে তারও অগাধ বিশ্বাস। সে জানে, অন্তত বাবা জ্যাঠারা কিংবা দাদুরা নাকি তার বাবার কুষ্ঠিতেও দেখেছেন— এক বয়সে বাবাকে অর্থকষ্টে পড়তে হবে। তার ঠাকুরদার কুষ্ঠিতে ছিল নাকি শতায়ু হবেন তিনি। তাও প্রায় মিলে গেছে। বাবার কাছেই শোনা। ঠাকুরদার কনিষ্ঠ সন্তান যাতে দুধে ভাতে থাকে তার ব্যবস্থারও ত্রুটি রেখে যাননি। কিন্তু বাবার ভাষায়, কর্মফল খণ্ডাবে কে! কুষ্ঠিতেই তার এমন নাকি হবে লেখা আছে।

তারও কুষ্ঠি আছে। তাতেও অনেক কথা, বিদ্যা, যশ, খ্যাতি। রাজপুরুষের ভাগ্য। তার সম্পর্কে এত সব ভাল কথা লেখা আছে বলেই বোধ হয় কুষ্ঠির ফল বিচারে যে যার নিয়তি জেনে নিতে পারে— কোন অতীত থেকে এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা— বাপ পিতামহ— থেকে প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, সবার কুষ্ঠির ফল বিচার একই রকম— গ্রহদোষ খণ্ডনের জন্য নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান ও করা হয়ে থাকে। বাবার বেলা গ্রহদোষ খণ্ডন করা যায়নি। তার বেলা জীবন মসৃণ, আর যশ বিদ্যা খ্যাতির কাঙ্গাল কে না হয়! সে লাবণ্যর বিশ বাইশ বছর বয়সে মৃত্যুযোগ আছে জেনে কেমন জলে পড়ে গেল। বলছে কি! এমন সুন্দর মেয়েটা মরে যাবে বিশ বাইশ বছর হতে না হতেই। সে ভাবতে গিয়ে বিমর্ষ হয়ে গেল।

আর দেখল লাবণ্যর মুখ ততোধিক বিমর্ষ। সে মাথা নিচু করে বসে আছে।

সে লাবণ্যকে সাহস দেবার জন্য বলল, কুষ্ঠি ঠিকুজির সব কথা ফলে না জানিস!

খারাপটা ঠিকই ফলে।

ইন্দ্র চুপ করে গেল। খারাপটা ঠিকই ফলে। তার বাবার কুষ্ঠির ক্ষেত্র বিচারেও সে সত্য প্রমাণিত। সে আর কি বলে লাবণ্যকে সমবেদনা জানাবে

কিংবা সাহস দেবে বুঝে পেল না।

॥ সাত ॥

ট্রেনটা যত ছুটছে তত ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ছে ইন্দ্র।

যেন কোনো প্রিয়জন সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে শুয়ে আছে। সে অপেক্ষা করছে ভিজিটিং আওয়ারের জন্য। সেলাইন, অক্সিজেন চলছে— ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, আটচল্লিশ ঘণ্টা পার না হলে কিছু বলা যাবে না। সে ঘড়ি দেখছে, ঘণ্টা পড়লেই বেডের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। আছে তো, বেঁচে আছে তো! বেড খালি হয়ে যায়নি তো! চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে সেই প্রতীক্ষার মতো আজকের এই তীর্থযাত্রা।

সে খবর কভার করতে যেখানেই গেছে— কত জায়গায় তাকে ছুটে বেড়াতে হয়, খুঁজেছে, আত্মীয়স্বজন যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, জানতে চেয়েছে, সোনামাসিরা কোথায় আছে! কেউ খবর দিতে পারে কি না। একবার সে দেওঘরে গিয়েছিল। সেখানে চিনিমামা আছেন। তাঁর কাছেও খবর নিয়েছে। না, যুদ্ধ শেষ, দেশভাগ শুরু— তখন থেকেই হিরণ, লাবণ্যরা অনেকের মতোই নিখোঁজ।

সত্যি যদি সেই হিরণ হয়! তবে তারা এমন একটা মফস্বল শহরে আছে ভাবতেই কেমন গোলমালে পড়ে গেল। কতবার সেখানে গেছে! যদি খোঁজ খবর নিত! কোনো আত্মীয় না থাকলে, কার কাছেই বা নেবে! সে তো লাবণ্যকে দেশভাগের পর থেকে দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। লাবণ্য বেঁচে আছে, না তার কোষ্ঠির ক্ষেত্র বিচারে খারাপটা ফলে গেছে। ভাবলেই সে কেমন আতঙ্কে পড়ে যেত। লাবণ্য ভাল থাকুক, আর কিছু চায় না। তার অপেক্ষায় সে নেই, না থাকারই কথা। লাবণ্য তাকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু কেন যে মন থেকে নারীর সেই আশ্চর্য ঘ্রাণ মুছে দিতে পারল না, বুঝতে পারে না। আর নিঃসঙ্গ জীবনে লাবণ্যর স্মৃতিই শুধু অপেক্ষার কথা বলে।

কোনোদিন প্রেসক্লাব থেকে মত্ত অবস্থায় ফিরে সে মেসে গোলমাল শুরু করে দেয়। যেন ভিতরে গভীর ক্ষত তার প্রকট হয়ে ওঠে। সে পাগলের মতো আচরণও করে ফেলে। সকালবেলায় সব মনে হলেই আফশোষ। ঘরে ঘরে গিয়ে বলবে, দাদা বেশি ডোজ হয়ে গেছিল— মনে কিছু কর না।

হাত ধরে ওরা টেনে বসায়।

আরে রাখ তো! বস। চা বলি।

সকালবেলার ইন্দ্রকে দেখলে, বোঝাই যায় না রাতে সে সারা মেসে তাণ্ডব করেছে। অভ্যস্ত হয়ে গেলে যা হয়, কেউ তাকে জোর করে ধরে এনে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। শেকল তুলে তালা মেরে চলে যায়। কোনোদিন মেসের বান্ধবরাই সিঁড়ি থেকে তুলে আনে। সে আর উঠতে না পেরে সিঁড়িতেই শুয়ে থাকে। তাকে তুলে এনে জুতো মোজা খুলে বিছানায় শুইয়ে দেয় তারা। মশারি খাটিয়ে দেয়। বলাবলি করে, ছেলেটার এত কী যে দুঃখ বুঝি না!

ওরা কী করে জানবে লাবণ্যকে সে কিছুই দেয়নি। মাত্র সামান্য দামের একটা ঝিনুকের নৌকা উপহার ছাড়া।

লাবণ্য তাকে সব দিতে চেয়েছিল।

তাকে বেঁচে থাকার, বড় হবার, এবং যশ খ্যাতির শিখরে ওঠার অনুপ্রেরণা পর্যন্ত দিয়েছে। — তুমি বড় হলে আমার আর কিছু লাগে না বলেছে।

যেন এই মাতাল হওয়া গোপন অভিমান কিংবা ক্ষোভ থেকে। আশ্চর্য,পরে ভাবে, লাবণ্যর কি দোষ! তার তো কথা ছিল, আগে চিঠি দেবার। তার তো প্রমিজ ছিল। প্রমিজ সে রক্ষা করেনি।

এটা তো লাবণ্যরও প্রমিজ।

তুমি না দিলে আমি দিই কী করে। প্রমিজ তো তোমার আগে দেবার। আমি দিলে, প্রমিজ থাকে কী করে।

তখন তার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়। অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। সে না দিতেই পারে চিঠি। আর বড় হয়ে চিঠি যখন দিল, উত্তর পেল না।

আবার দিল— না নেই।

আবার আবার। সে চিঠি দেয়— ফিরে আসে চিঠি। কোনোটা ফিরে আসে, কোনোটা আসে না।

প্রথম ভাবত ডাকবিভাগের গণ্ডগোল কিংবা ওরা অন্যত্র চলে গেছে।

আবার ভাবত, লাবণ্যর আর চিঠি দেবার অধিকার নেই।

আর তখনই সে বসে যেত। সারাদিন ঘুরে খবর সংগ্রহ—সন্ধ্যায় অফিসে বসে নিজের কলাম লেখা, এসব সেরে ক্লান্ত ইন্দ্রের মনে হত, কেউ আর তার অপেক্ষায় নেই। দুমড়ে মুচড়ে যেত ভেতরটা। সে প্রেসক্লাবে ঢুকে পড়ত।

তারপর কেমন গোলমাল শুরু হয়ে যায় মগজে। গ্লাসে সে দেখতে পায়, লাবণ্য আবৃত্তি করছে, দেখতে পায় কলের গানের সামনে লাবণ্য হাঁটু মুড়ে বসে আছে, শুনবে ইন্দ্রদা বইটা দেখ বড় হলে। পার্বতীর পাঠ করেছে যমুনা। আমি দেখেছি। এত মন খারাপ হয় না!

বড় হলে, কথা ছিল, সে আর লাবণ্য একসঙ্গে বসে দেবদাস দেখবে। মুক্তি দেখবে। ইন্দ্র যে বাইস্কোপ কি তাই জানত না। নাঙ্গলবন্দের বান্নিতে চণ্ডীদাস দেখে বুঝেছে বাইস্কোপ বড় মজার খেলা। না, দেবদাস দেখা হয়নি।

সুযোগ পেলে এখনও একসঙ্গে দেখবে বলে বসে আছে। ভুলে যাবার জন্য, না নিজেকে নিঃশেষ করে দেবার জন্য। কে জানে! সকালে ওঠে আফশোষ, না আর খাবে না। প্রমিজ। দু-পাঁচদিন, তারপর ছেঁড়া কাগজের মতো সব অর্থহীন মনে হয়।

লাবণ্য নিজেকে মেলে দেবার জন্য কতভাবে যে সুযোগ করে দিয়েছিল। সেই বয়সে অপরাধবোধ কিংবা নিন্দা হতে পারে, লজ্জা সংকোচও বড় কারণ—সব মিলে তাকে কেন যে এত আড়ষ্ট করে রাখত।

সব সময় মনে হত সে ছোট হয়ে যাবে। লাবণ্য ছোট হয়ে যাবে।

যদি কেউ দেখে ফেলে। ধরা পড়ে যায়—মুখ দেখাবে কী করে!

না হলে লাবণ্য কিছুতেই পারত না বলতে, যা, আমি যাচ্ছি।

যাত্রার পালা শুরু। পশ্চিম পাড়ায় দোল উপলক্ষে আখড়ায় যাত্রা গান। নরসিন্দির হরিহর অধিকারীর দল। মারীচ বধ পালা। সেই যাত্রা গান দেখতে গেছে সবাই। ইন্দ্র লাবণ্য মঞ্জু সবাই। মাসি মামী সবাই। শুধু হরেনদা বাড়ি পাহারায় আছে। ধূ ধূ বালির প্রান্তর পার হয়ে যেতে হয়। পূর্ণিমা রাত। গরম হাওয়া বইছে। পাতা ঝরা শেষ—নতুন পাতার বাহার গাছে গাছে। গাছে গাছে আমের মুকুল—মৌমাছিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। রাতে তারা জ্যোৎস্নায় দল বেঁধে গিয়েছিল।

পাড়াকে পাড়া খালি।

শুধু বুড়ো বুড়িরা জেগে আছে। হাঁচি কাসির শব্দ কানে আসছিল।

এ-সময় চোর ছ্যাচোরের উপদ্রব বাড়ে।

লাবণ্যর কী উৎসাহ, সে প্রায় ফুলপরী সেজে ঘর থেকে বের হয়েছিল।

ও ইন্দ্রদা হল! চল না! দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ইন্দ্র সেদিন উঠোনে বের হয়ে লাবণ্যকে দেখে ভেবেছিল, জ্যোৎস্নাকুমারী। জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায় যে সব দেবীরা লাবণ্য তাদেরই একজন।

সে বলল, যা আমি যাচ্ছি।

না। সঙ্গে চল।

সঙ্গে যাবারই কথা। কিন্তু ঠাকুর না শুইয়ে সে যেতে পারে না। রান্নাবাড়িতে খাওয়ার ধূম। যে যার মতো খেয়ে রওনা হয়ে গেছে। কেবল মাসি মামীরা

বাকি। তারও খাওয়া হয়নি। লাবণ্যর তাড়াতে সে তিষ্ঠোতে পারছিল না! কোনোরকম মুখে দুটো গুঁজে ঘরে ঢুকে জামা প্যান্ট পরে বের হয়ে এলে দেখল হিরণ মঞ্জু রেডি।

পূব পাড়া পশ্চিমপাড়ার মাঝে বিশাল বালির প্রান্তর। রাস্তায় লোকজনের সাড়া। দেরি হয়ে গেলে জায়গা মিলবে না। সাঁজ লাগা শুরু, আর মানুষজন ঘরবাড়ি খালি করে বের হয়ে পড়েছে। আগে না গেলে জায়গা দখল হয়ে যাবে।

লাবণ্য তো জানে মনমোহন কর্তার বাড়ির লোকজনরা সম্মানিত মানুষ। আখড়ায় ভুবন গোঁসাইর রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা—বৈরাগী বাউল, মচ্ছব আর দোল পূর্ণিমা—সারাদিন হোলি, সাঁজ বেলায় যাত্রাগান—পরদিন মচ্ছব। সাধু সাধু। গোঁসাইর এই উৎসবে মনমোহন কর্তার বাড়ির লোকজনদের বসার আলাদা ব্যবস্থা। অঞ্চলের বাবু মানুষেরা বসবে সামনে। ঠিক আসরের চারপাশ ঘিরে সতরঞ্চি পাতা হবে। সাদা চাদর বিছানো হবে। বাঁশের খুঁটি পুঁতে বসার আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। জায়গা বেদখল হয়ে যে যাবে না, লাবণ্য ভালই জানে।

তবু লাবণ্যর তাড়া।

আসলে লাবণ্যর ভয়, যা মানুষ ইন্দ্রদা, শেষে নাও যেতে পারে। সারাদিন তাকে বড় মামী খাটায়। ছুটির দিনে আরও বেশি। সে নীরবে কাজ করে। দরকারে গাছে উঠে ডাল কেটে দেয়। এ-দেশটায় জ্বালানির বড় আকাল। বর্ষাকালে শুধু কয়লায় রান্না। তাও নৌকা এলে। মহাজনি নৌকায় কয়লা বোঝাই হয়ে আসে ঘাটে ঘাটে। সম্পন্ন গেরস্থরা যে যার মতো কয়লা সঞ্চয় করে রাখে বর্ষার জন্য। বড় মামী কয়লা না কিনে টাকা বাঁচায়। বন জঙ্গল, কাঠ পাতা দিয়ে রান্না করতে পারলে দু-পয়সা সাশ্রয়। এটাই হয়েছে কাল। কৃপণ স্বভাবের এই মহিলাটি, চায় না, গ্রীষ্মের দিনে কিংবা শরৎ হেমন্তে কয়লা খরচ হোক। বাড়িতে ইন্দ্র তো আছেই।

আসলে লাবণ্য এ-সব কারণেও ভাবতে পারে ইন্দ্রদাকে তাড়া না দিলে যাবে না।

তা-ছাড়া ইন্দ্র বোঝে, সে না গেলে লাবণ্যও ছল ছুতোয় বাড়ি থেকে যেতে পারে। এটা যে শেষ পর্যন্ত কোনো কেলেঙ্কারিতে ফেলে দেবে না তাও বলা যায় না। সে যতই লাবণ্যকে না দেখতে পেলে অস্থির হয়ে পড়ুক, তবু কেন যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে পারে না। লাবণ্য যেন ইচ্ছে করলে সব পারে। পারে বলেই ভয়।

সুতরাং ইন্দ্র বলল, চল।

পুকুর পাড় ধরে তারা হাঁটছে। গাছপালা এবং নীল আকাশের নিচ দিয়ে তারা যাচ্ছে। চমচমে জ্যোৎস্না। এর আছে আশ্চর্য মোহ। কিংবা কোনো গভীর রহস্যময়তা সৃষ্টি করে থাকতে পারে নরনারীর মধ্যে। তার গা ঘেসে লাবণ্য হাঁটছিল। সেনেদের অর্জুন গাছটা পার হলেই কাছারি বাড়ির মাঠ। লোকজন যাচ্ছে। কারো হাতে হারিকেন। জ্যোৎস্নায় হারিকেন নেওয়া কেন! তবু মানুষ হারিকেন হাতে নিয়ে হাঁটতে বুঝি ভালবাসে। অন্তত ইন্দ্রের তাই মনে হল। জীবনে পোকা মাকড়ের উপদ্রব থেকেই যায়।

ওরা দল বেঁধে যাচ্ছে। ঠিক দল বেঁধে বললে ভুল হবে। বড়দা রাঙ্গামাসী ছোট দাদু, সাঁজবেলাতেই চলে গেছে। ছোটদাদু আখড়ার প্রভাবশালী মানুষ। তাঁকে থাকতেই হয়। তার পরামর্শ মতো গোস্বামীজী চলেন। তিনি না থাকলে অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি। বড়দারাও চলে গেছে আখড়ার চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে। মেলার মতো বসে। পরগনার লোকজন জড় হবে। সেজেগুজে তরুণীরা আসে। মজুমদার বাড়ির মেয়েদেরও আজ দেখা যাবে। শহরে থাকে। দোল পূর্ণিমায় হোলি খেলতে গাঁয়ে চলে আসে। তাদের এত তাড়াতাড়ি চলে যাবার কি আকর্ষণ থাকতে পারে, ইন্দ্র ভালই বোঝে।

মাসি মামীরাও যাবে দল বেঁধে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি বিকাল থেকেই ছোটাছুটি—কে কার সঙ্গে যাবে। কখন যাবে। যাবার আগে যেন ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল থেকেই ইন্দ্র দেখেছে পালবাড়ির রানী মাসিরা এসেছিল। তারা বলে গেছে, সোনামাসির সঙ্গে যাবে।

সুতরাং এ-সব অনুষ্ঠানে সমবয়সীরা এক সঙ্গে যেতে ভালবাসে।

তারাও সমবয়সী।

ইন্দ্র হিরণ মঞ্জু লাবণ্য।

তাদের এই ছোট দলটার লাঠিদার ইন্দ্র। তারা কাছারি বাড়ির মাঠ পার হয়ে সরকারদের বাগানে পড়েছে। জ্যোৎস্নায় হেঁটে যাবার আলাদা এই মজা, এবং সঙ্গে লাবণ্য আছে বলে সে খুবই প্রসন্ন।

সে ঠাট্টা করছিল, এই সুর্পনখা, এত আস্তে হাঁটছিস কেন। পেছনে পড়ে থাকছিস। কি রে।

তুমি যাও না। আমার জন্য দাঁড়াতে হবে না।

আসলে ইন্দ্র বুঝতে পারছিল, এ-সময়ে সে শুধু ইন্দ্রকে নিয়েই হাঁটতে চায়। হিরণ মঞ্জু এসে এমন জ্যোৎস্নার আকর্ষণকে যেন মাটি করে দিয়েছে।

হিরণ তার গা ঘেঁষে হাঁটছিল বলে রাগ।

সে তবু দাঁড়াল। বলল, আয়! তোর যে কি হয়।

কি হবে আবার!

এত তাড়া, ইন্দ্রদা তাড়াতাড়ি কর। আর এখন তুই পেছনে পড়ে যাচ্ছিস।

আমি বাবা তোমাদের মতো জোরে হাঁটতে পারি না। তোমরা যাও না।

এটা যে ক্ষোভ অথবা অভিমানের কথা ইন্দ্র ভালই বোঝে। যেন বালির প্রান্তরে পড়লে তার পাশে শুধু ইন্দ্রই থাকবে। বালির প্রান্তর নদীর মরা খাত সে বোঝে। তরমুজের চাষ হয়—তবে গোপের বাগের দিকে। এদিকটায় সুনসান প্রান্তর ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। লাবণ্যকে দেখলে মনে হয় সে কোনো জমিতে নেমে যেতে চায়। কতদিন পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে বলেছে, চল না যাই।

এত রাতে! তোর কি মাথা খারাপ আছে।

আমি তো মরে যাব। আমার মাথা ভাল খারাপ দিয়ে তোমার কি হবে। তুমি কিছু বোঝো না। আচ্ছা ইন্দ্রদা তুমিই বল, আমার তো এখন এমন ইচ্ছেই হবে। তোমারও। তুমি না কেমন জানি!

ইন্দ্র বলল, তোর আর শিক্ষা হবে না।

কেন এমন কথা মেয়েটা ঠিক বুঝত। সে লুকিয়ে টিফিনের পয়সা দিত তখন। আর ঐ পয়সায় সে স্কুলের টিফিনে মচ্ছব শুরু করে দিয়েছিল। তার পক্ষে দু-আনার টিফিন অনেক। সে তার ক্লাসের বন্ধুদের নিয়ে যে-দিনকার যা কিনে খেত। দু আনা কম নয়, দু—আনা মানে আটটা তামার পয়সা। একটা তামার পয়সা দিলে আস্ত একটা রাজভোগ—একটা পয়সা দিলে দুটো চমচম। এক পয়সায় কত কিছু পাওয়া যায়। পয়সায় চারটা খিরাই। পয়সা ফেরত দিলে লাবণ্য গুম মেরে যেত। এ জন্য দিয়েছি, ক্ষোভ! একদিন পয়সা তার মুখেই ছুঁড়ে মেরেছিল। আর কোনোদিন আমার সঙ্গে কথা বলেছ তো মা কালীর দিব্যি।

সে কি আর করে!

সে আর পয়সা ফেরত দিতে সাহস পেত না। এত খাওয়াও যায় না। সে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এতগুলো পয়সা রোজ ওড়াতো। বড়দারা টের পেয়ে বলেছিলেন, তুই এত পয়সা পাস কোথা!

সে তো বলতে পারে না, লাবণ্য দেয়। কোনো সাড়া দেয়নি।

আর তারপর যা হল!

বড়মামীর লক্ষ্মীর কৌটায় রুপোর টাকা থাকে। আট দশ টাকা ফাঁক। এক

সকালে টের পেয়েই বড় মামী বাড়ি মাথায় করেছিল।

চোর। বাড়িতে চোর পোষা হচ্ছে! আমার লক্ষ্মীর টাকা চুরি! বের করছি! লক্ষ্মীর টাকা ফাঁক করে দিয়ে তেনার নবাবী হচ্ছে।

কার উদ্দেশে এই বিষোদগার ইন্দ্র টের পেয়েই কেমন কেঁচো হয়ে গেছিল। লাবণ্যর সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। বোধ হয় ফোঁসছে। সে দেখতে চায় শেষ পর্যন্ত কী ঘটে। তার ভয় কি! সে তো সত্যি টাকা চুরি করেনি। তবু লজ্জায় সংকোচে তার কেন জানি মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।

আর হঠাৎ তখন উঠোনে লাবণ্য বের হয়ে চোপা শুরু করে দিল। এ লাবণ্যকে সে যেন চেনে না।

খবরদার বড় মামী একদম ইন্দ্রদাকে দুষবে না। তোমার পুত্রটি তো নেশা করে। সিগারেট খায়। সরকার বাড়ির ক্ষমাদিকে চিঠি দেয়। তার নবাবী তুমি দেখতে পাও না! চোখ তোমার অন্ধ!

ছোট মুখে বড় কথা! সোনা শুনছিস!

সোনামাসিরও মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। উঠোনে নেমে মেয়েকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মুখ চেপে ধরেছে। দু-জনের এই ধস্তাধস্তি দেখে সে থম মেরে গেছিল।

ইস্, লাবণ্য তুই এত নির্বোধ!

কিন্তু লাবণ্যও ছাড়বার পাত্র নয়। যেন সে অনেক ইতরামি সহ্য করেছে—আর না। সে হঠাৎ বলতে বলতে হাউ-হাউকরে কাঁদছিল। ইন্দ্রদা তুমি কেন এ-বাড়িতে পড়ে আছ! তুমি চলে যাও। আজই চলে যাবে। এমন ছোটলোকের বাড়িতে মানুষ থাকে! ইন্দ্রদা চোর! সে চুরি করেছে! তেনার নবাবী—না তোমার বড় পুত্রের নবাবী।

সব ফাঁস হয়ে গেল।

সে যে বড়দার চিঠি ক্ষমাদিকে দিয়ে আসে একমাত্র লাবণ্যকেই বলেছে। লাবণ্য গোপন খবর ফাঁস করে তাকে এত বড় ঝামেলায় ফেলে দেবে বুঝতেই পারেনি।

রাঙ্গামামা বাড়ি এসে তাণ্ডবে পড়ে গেছিলেন। বাড়ির মুখরা বৌটি যা তা বলে যাচ্ছে। সোনামাসিকে পর্যন্ত গাল দিচ্ছে। সোনামাসি নিথর।

রাঙ্গামামা ডাকল, ইন্দ্র শোন।

সে ঘর থেকে নেমে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

তুই টাকা চুরি করেছিস?

না।

বড়দা আম গাছতলায় ঘোরাঘুরি করছে।

হঠাৎ রাঙ্গামামা ক্ষেপে গিয়ে বললেন, সব কটাকে পেটাব। মারের নাম গুরুঠাকুর। বলে লাঠি বের করতেই বড়দা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। যা মাথা গরম মানুষ, যাকে সামনে পাবে তাকেই ঠ্যাঙ্গাবে।

ইন্দ্র একইভাবে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না।

রাঙ্গামামা চিৎকার করে উঠলেন, তুই এত পয়সা পাস কোথা!

সে তো বলতে পারে না লাবণ্য দেয়। মুখে তার রা নেই। সে যতই মার খাক, মেরে ফেললেও বলতে পারবে না—রোজ লাবণ্য দু-আনা পয়সা লুকিয়ে দেয়। লাবণ্যর মাথায় এত বড় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেবার সাহস তার নেই। বললেই লাবণ্যকে ঠেস দিয়ে কথা বলতে ছাড়বে না বড়মামী।

বুঝলে না ঠাকুরপো, পীড়িতের নাগর এয়েছেন। এ-বাড়ি উচ্ছন্নে যাচ্ছে টের পাচ্ছ!

কিন্তু লাবণ্য শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে বলল, আমি দিই। সেই কোন সকালে খেয়ে যায়, তা যা খাবারের ছিরি—বিকেলে এসে জলখাবার পর্যন্ত পায় না। আমি দিই! রোজ দু-আনা দিই। সবাই খাবে, আর ইন্দ্রদা সারাদিন না খেয়ে থাকবে! কষ্ট হয় না, একবার ভেবেছ তোমরা! কে চুরি করেছে বুঝতে পারছ না।

তারপর লাঠ্যৌষধি বড়দার পিঠে। তার প্রয়োগে শেষ পর্যন্ত না স্বীকার করে পারল না। আটটা কাঁচা রুপোর টাকা থেকে তিনটে বের করে দিলে, বড়মামী আরও ক্ষেপে গেল! এত বড় ছেলেটাকে চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বড়মামী। এক প্রস্ত মামা, পরের প্রস্ত মামী।

রাঙ্গামামা ছুটে গেলেন।

ছাড় বলছি। রাঙ্গামামা বড়মামীর হাত ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু মহিলার সেই ক্রোধ এবং রক্তচক্ষু মনে হলে এখনও ইন্দ্রের গায়ে জ্বর চলে আসে।

সোনামাসি বলেছিল, লাবণ্য লুকিয়ে দিতে গেলি কেন! তোদের পয়সা দিবি কার কি বলার আছে। রোজ দিবি। পদ্মদির কপালে শেষে এত দুর্ভোগ, ছেলেটা পরের বাড়িতে পড়ে আছে—মায়া হয় না! এ-বাড়ি শেষে এখানে এসে ঠেকেছে। তারপর ছোটদাদুকে বলেছিল, কাকা, হয় এরা থাকবে, নয় আমরা থাকব। এত ছোট নজর। যত দোষ ইন্দ্রর! চুরি করল ছেলে, আর ধরল

ইন্দ্রকে। এত অমানুষ বড়বৌ!

থাম থাম সোনা। দু-হাত উপরে তুলে দাদু সবাইকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। কে থামে!

দু-পক্ষই সমানে লড়ছে।

ইন্দ্র বোঝে এ-জন্য সেই দায়ি। তার এত খারাপ লাগছিল! সে কখন বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে। চুপচাপ নদীর পাড়ে হেঁটে যাবে বলে। তার সত্যি ভাল লাগছে না। লাবণ্য আছে—তাকে ফেলে চলেও যেতে পারে না। যেন এ-বাড়িটায় যতই নির্যাতন চলুক, লাবণ্যকে ফেলে কোথাও যেতে পারবে না।

আর সে দেখেছিল, লাবণ্য পিছু পিছু ছুটে এসেছে। হাত টেনে ধরেছে।

ইন্দ্র বলল, আমাকে কেন পয়সা দিতে গেলি বল!

কি করব। আমি যে পেট ভরে খেতে পারি না। তুমি ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছ, আমার খাওয়া রোচে! বল বমি পাবে না! আমার কষ্টের জন্য দিয়েছি ইন্দ্রদা। তোমার কষ্টের জন্য নয়। কেন যে মরতে বাবা আমাদের এখানে পাঠালেন। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল লাবণ্য।

কেউ দেখে ফেলতে পারে। সে আর একা হেঁটে যেতে পারল না। বলল, যাচ্ছি। তুই যা। তোর সঙ্গে দেখলে বড় মামীর গোসা হবে।

বড় বড় ডে-লাইট জ্বলছে সামিয়ানার নিচে। সারা আখড়া জুড়ে কোলাহল। ভিড়, মানুষজন গাদাগাদি হয়ে বসে আছে। ক্লেরিওন্যাট বাজছে। ইতিমধ্যে একবার যাত্রা পার্টির কনসার্ট বেজে উঠেছিল। আশ্চর্য মোহ এই মানুষের ভিড়, ঝাড় লণ্ঠন, হ্যাজাক ডে-লাইট ঝুলছে। আসরের দর্শককুল নিথর। এবং বিবেকের গান যখন চলছিল, তখনই লাবণ্য বলল, মা আমার ভাল লাগছে না। মা আমি যাচ্ছি।

ঠিক আসরের নিচে বলে বাস্তে আস্তে কথা বলছিল লাবণ্য। তবে তারা এক জায়গায় বসেছে বলে ইন্দ্র শুনতে পাচ্ছে সব।

কোথায় যাবে লাবণ্য!

সোনামাসি বলল, তোর কী হয়েছে!

শরীর খারাপ লাগছে।

জ্বর জ্বালা হয়নি তো। বলে সোনা মাসি লাবণ্যর গলায় হাতের পিঠ রেখে দেখলেন।

শরীর তো ঠাণ্ডা।

কেমন বমি বমি পাচ্ছে। লাবণ্য বলল।

সেটা পেতেই পারে। যতদূর চোখ যায় চারপাশে মানুষের মাথা। স্বেচ্ছাসেবকেরা গোলমাল থামাবার জন্য বিশাল সামিয়ানার ফাঁকে ফোকরে বসে আছে। বুকে ব্যাজ। হাতে লাঠি। বৈদ্যেরবাজার থানার দারোগা বাবু পর্যন্ত এসেছেন। পুলিশও ভিড় সামলাচ্ছে। আসরের সামিয়ানা পার হয়ে চারপাশে বিশাল দেয়ালের মতো দর্শকের ভিড়। তারাও ঠেলাঠেলি করছে—যদি ভিতরে ঢুকে বসার জায়গা পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাসেবকেরা পাহারায় আছে। মাঝে মাঝে লোকজন উঠে দাঁড়ালে হৈ রৈ শব্দ। তার উপর ভ্যাপসা গরম। হাওয়া বাতাস খেলছে না। এমন পরিস্থিতিতে লাবণ্যর বমি বমি ভাব হতেই পারে।

সোনা মাসি বিরক্ত।

কেন যে তোরা এত জ্বালাতন করিস। কে আসতে বলেছিল মরতে। বাড়িতে থাকতে পারলি না। ননির পুতুল—গলে যাচ্ছে।

লাবণ্যও বলেছিল, আমি কি জানতাম শরীর খারাপ করবে।

যা খুশি কর। কে তোমাকে এখন নিয়ে যাবে। কাকে দিয়ে পাঠাব! আর বাড়ি কি কাছে! তোমাকে পৌঁছে দিয়ে ফের যাত্রা দেখতে চলে আসবে!

ছোটদাদুকে বল না! দিয়ে আসুক।

ছোট কাকা যাবেন কী করে! বুড়ো মানুষ। সারাদিন খাটাখাটনি গেছে। আখড়ার অতিথিশালায় তিনি শুয়ে আছেন। তোদের জন্য মানুষটা কি এক দণ্ড বিশ্রাম পাবেন না।

আমি কি করব। বমি-টমি হলে জানি না।

ইন্দ্র চুপ করে ছিল। এ-বিষয়ে তার কোনোই যেন আগ্রহ নেই। একটা সোনার হরিণ তখনই আসরে ঢুকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাচ্ছে। দূরে রামচন্দ্র। আসরের শেষ মাথায়। হাতে তীর ধুনক। গেরুয়া পোষাক পরনে। খুঁজছে। সোনার হরিণ খুঁজছে। মানুষ এই সোনার হরিণের নৃত্য দেখছে। মুখোস পরা হলুদ রঙের সাদা ছোপ ছোপ আচ্ছাদন গায়ে। হাতে পায়ে ভর দিয়ে একটা মানুষ যে আচ্ছাদনের মধ্যে আছে কেবল তারা আসরের কাছে বসে ছিল বলেই টের পাচ্ছে।

কি মজা!

এমন মজা ফেলে কেউ যায়!

ইন্দ্র সোনার হরিণের নৃত্য দেখছে।

কনসার্ট বাজছিল।

এমন সুন্দর কনসার্ট ভিতরে বেজে উঠলে ইন্দ্রও খুব একটা খুশি হয়নি লাবণ্যর আচরণে। সেও ভেবেছে, সত্যি তো এমন মজা ফেলে কেউ যায়। তার ভয় করছিল, আবার রাগও হচ্ছিল। ভয়, সত্যি যদি লাবণ্যর শরীর খারাপ হয়। আর রাগ—সময় অসময় বুঝলি না!

আর তখনই সে শুনতে পাচ্ছে, লাবণ্য ডাকছে, ও ইন্দ্রদা।

ইন্দ্র গা করছে না।

ইন্দ্রদা শুনছ।

লোকে কি ভাববে। দর্শককুল থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, পিন ড্রপ সায়লেন্ট।

অর্থাৎ গোলমাল হলেই এই এক উচ্চারণ—পিন ড্রপ সায়লেন্ট। দর্শককুল যখন এত মুগ্ধ বিস্ময়ে সোনার হরিণের নাচ দেখছে তখন লাবণ্যর এই তাড়া আদৌ নিস্তরঙ্গ থাকতে পারে না।

দর্শককুলের কেউ চায় না টু শব্দ হোক।

লাবণ্য শুনবে কেন! সে তো সে জাতের মেয়ে নয়। সে বলল, কি, শুনতে পাচ্ছ না! আমাকে বাড়ি দিয়ে এস। বসতে পারছি না।

তখনই সোনামাসি তার দিকে তাকিয়ে বলল, যা, কি করবি! আমার কপাল! দিয়ে চলে আয়।

সোনামাসির নির্দেশ অমান্য করার সাহস তার নেই। লাবণ্য বললেই যাওয়া যায় না। সোনামাসি না বললে, সে লাবণ্যকে নিয়ে নির্জন বালির প্রান্তরে নেমে যেতে পারে না। এমন সাধের যাত্রাগান মাটি করে দিল লাবণ্য। বিরক্ত হয়ে বলল, চল, মাঠ পার করে দিয়েই চলে আসব। কাছারি বাড়ি থেকে তোকে একা যেতে হবে। পারবি তো!

সোনামাসি বলল, না বাবা, ওকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিস। হরেন কাকাকে বলে আসবি। লাবণ্যর শরীর খারাপ। একা শুতে ভয় পেলে, হরেনদা যেন বারান্দায় বসে থাকে।

লাবণ্য তারপর উঠে দাঁড়াল। ইন্দ্র আর কি করে।

তারা উঠে পড়তেই আড়াল আবডাল সৃষ্টি হয়। গুঞ্জন ওঠে দর্শককুলের মধ্যে। কেউ চিৎকার করে ওঠে, পিন ড্রপ সায়লেন্ট।

ইন্দ্র আসরের বাইরে এসে একটা কথা বলল না। সে ফুঁসছে। তার ভাগ্যে নেই। লাবণ্য তাকে যাত্রাগানে এসেও রেহাই দিল না। সে গুম মেরে আছে। হাঁটছে। বাইরে বের হতেই বেশ ঠাণ্ডা আমেজ টের পেল। গরম হাওয়া নেই।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল লাবণ্য। তার পাশে এসে বলল, রাগ করছ আমার উপর!

কথা বলবি না! তাড়াতাড়ি হাঁট।

তাড়াতাড়ি আমি হাঁটতে পারব না।

লাবণ্য এবারে বলল, আহা কি জ্যোৎস্না।

দূরে যাত্রাগানের কনসার্ট বেজেই চলেছে।

এই নিশীথে পরিভ্রমণ কোনো কিশোর কিশোরীর যে রূপকথার চেয়েও বিস্ময়ের, টের পেল মাঠে নেমে।

সারা বিশ্ব অমোঘ এক জীবন মহিমায় যেন আপ্লুত। নক্ষত্র ফুটে আছে আকাশে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় হাজার নক্ষত্র নিহারিকার মাঝে এই বিশ্ব সত্যি অণু পরমাণু— তবু কি নেই! সামনে সেই বালির প্রান্তর। বালির প্রান্তরে নেমে লাবণ্য বলল, তোমার ভাল লাগছে না আমাকে নিয়ে হাঁটতে!

জানি না।

আমার শরীর নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই দেখছি!

বেশ তো হেঁটে যাচ্ছিস। কিছু হয়েছে বলে ত মনে হয় না! শরীর খারাপ হলে কেউ এত খুশিমতো কথা বলতে পারে না।

না, তুমি আমার শরীরের কিছু বোঝো না।

তোর শরীরে এমন কি আছে আমি বুঝি না! হেয়ালি করার স্বভাব।

বুঝলে রাগ করতে না!

রাগ করলাম কোথায়!

সত্যি বল রাগ করনি! জান আমার একদম ভাল লাগছিল না। তার চেয়ে দেখ কী সুন্দর জ্যোৎস্না, নির্জন প্রান্তর— দূরে গাছপালার ছবি—মাথার উপর আকাশ—আর শুনতে পাচ্ছ, এখানেও আছে কীটপতঙ্গের আওয়াজ—নিরন্তর কনসার্ট বেজে চলেছে। বল ইচ্ছে হয় প্রকৃতির এই কনসার্ট ছেড়ে ভিড়ের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে বসে থাকতে! ভাল লাগে!

সে আবার বলল, সত্যি করে বলছ রাগ করনি!

বললাম তো, না।

না রাগ পড়েনি। গুম মেরে আছ কেন তবে। বল।

হাঁটবি না কেবল বকর বকর করবি।

এটাইতো রাগের কথা।

তোর কি মাথা খারাপ আছে।

আছে। বলেই সে বসে পড়ল।
আরে বসে পড়লি কেন! ওঠ। তোর ভয় নেই!
কিসের ভয়! কেউ তো নেই।
ইস—না আর পারছি না। লোকজন নেই, খা খা প্রান্তর—রাতও কম হয়নি, অশরীরিরা চলাফেরা করতেই পারে। কত রকমের শঙ্কা! তুই বলছিস কিসের ভয়! কেউ তো নেই!
কেমন বেহায়ার মতো লাবণ্য বলল, তুমি চলে যাও। আমি একাই চলে যেতে পারব!
ঠিক বলছিস চলে যেতে!
হ্যাঁ বলছি। তোমার এত আহ্লাদ নষ্ট করে দিলাম। আমার চেয়ে যাত্রাগান বেশি প্রিয় তোমার!
ইন্দ্রর কেমন হুঁশ ফিরে এল। বলল, তুই অযথা রাগ করছিস লাবণ্য। শরীর খারাপ সত্যি বলছিস!
তা বলব কেন!
তবে চলে এলি কেন!
কতভাবে তোমাকে বোঝাব ইন্দ্রদা! আমি যে আর পারছি না। আমি তো মরে যাব। ভয় পাব কেন।
সবাই মরে যায় একদিন। কেউ থাকে না।
আমি তো সব কিছু না জেনেই মরে যাব।
ইন্দ্র বলল, তোকে মরতে দিচ্ছে কে!
পারবে আটকাতে!
আলবৎ পারব।
তবে এস। বলে ইন্দ্রর হাত ধরে ছুটতে চাইল!
কোথায় যেতে চাস।
যেখানে গেলে তুমি আমাকে সত্যি বেঁচে থাকতে শেখাবে। বুঝব, আমি মরে গেলে সত্যি তুমি একা হয়ে যাবে। তোমার জন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।
কিন্তু শেষে লাবণ্য যা করল!
গাঁয়ের দিকে লাবণ্য যেতে চাইছে না। ঢালু প্রান্তরের শেষদিকটায় তরমুজের জমি—তারপর বিশাল বিলেন অঞ্চল। নিশীথের একি ভুতুরে খেলা শুরু করে দিল লাবণ্য।
ওদিকে যাচ্ছিস কেন!

এস না বলছি!
ইন্দ্রর বুক গলা শুকিয়ে উঠছে। সে কি তাকে নিয়ে নিখোঁজ হতে চায়! কোথায়, কতদূরে। এতো মানুষের ক্ষেপা স্বভাবের কথা বলে। অপরিণামদর্শী সে হতে পারে না। লাবণ্যকে নিয়ে সে কোথায় গিয়ে উঠবে! পালাতে চায়!
ইন্দ্র বলল, আমি যাব না।
কেন? আমি কি তোমাকে খেয়ে ফেলব।
জানি না, জানি না লাবণ্য। আমার এত সাহস নেই।
লাবণ্য হাত ছেড়ে বেশ কিছুদূর হেঁটে গেল। দাঁড়িয়ে থাকল।
সেও দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না। আবছা মতো দেখা যাচ্ছে লাবণ্যকে। যেন কোনো দেবী আবির্ভূতা হচ্ছেন। সে দেখল লাবণ্য ফ্রক তুলে নিচে কি টানাটানি করছে। নির্জন বালির প্রান্তরে গোটা ব্যাপারটাই কেমন ভুতুরে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
ও দিকে গেল কেন?
ডাকল, লাবণ্য চলে আয়।
দাঁড়াও আসছি।
সে হেঁটে গেলে বলল, আরে এদিকে আসছ কেন?
লাবণ্যর কি বাথরুম পেয়ে গেছে। পেতেই পারে। সেই কখন খেয়ে দেয়ে গেছে। ওরা বাথরুম টয়লেট কথাটা ব্যবহার করে বলেই এমন ভাবল। সে লজ্জা পেল। আসলে মেয়েটাতো খুলে কিছু বলে না। মেয়েদের যে বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না—এমন স্বভাব সে জানবে কি করে। সেতো লাবণ্যকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের আগ্রহে কখনও পড়ে যায়নি।
লাবণ্য তখনও দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছু চেষ্টা করছে করার। বসছে না। ফ্রক তুলে দাঁড়িয়ে কি যেন টানাটানি করছে। অথচ খুলতে পারছে না। সে যেতেও পারে না। গেলে লাবণ্য লজ্জা পাবে—বলতে পারে তুমি সত্যি দেখছি কিছু বোঝো না।
লাবণ্য নুয়ে পড়ছে। দু-হাতে কিছু খোলার চেষ্টা করছে পারছে না। তারপর না পেরেই যেন ডাকল, ও ইন্দ্রদা একটু আসবে।
সে গেলে দেখল লাবণ্য প্যান্টের উপর ফ্রক তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কুচি দেওয়া প্যান্ট। জানুতে উপচে পড়ছে জ্যোৎস্না—কোমল উষ্ণতার জন্ম হয় জানু দেশে। সে কিছুটা হতবাক্‌ই হয়ে গেছে।
কি হল?

দড়ির গিঁট আটকে গেছে। খুলতে পারছি না। ইস দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। খুলে দাও না। প্যান্ট নষ্ট হলে জানি না।

ইন্দ্র তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসল। সামনে লাবণ্য। তার পেটের কিছুটা খালি অংশ সে দেখতে পাচ্ছে। কোথাও হাত লেগে না যায়—সে আলগাভাবে চেষ্টা করল দড়ির গিঁট খুলতে। দু আঙুলে সে গিঁট খুঁজল! খুঁজে পেলে চেষ্টা করল। না খুবই শক্ত। টানাটানি করে গিঁট আরও শক্ত। কিছুতেই খুলতে পারছে না।

তার মুখের সামনে লাবণ্যর কোমর জংঘা। জংঘার ক্ষেত্রটি যেন হাত একটু নিচে নামালেই ছুঁতে পাবে। কিছুটা যে ঢিবির মতো মনে হচ্ছে, গিঁট খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেল। এবং সাদা সেই বাবুই বাসাটি খস খস করছে—যেন লাবণ্যর হুঁস নেই। সে দাঁড়িয়েই আছে।

যেন লাবণ্য চায় ইন্দ্রদা চেষ্টা করে দেখুক পারে কি না। যতক্ষণ না পারবে সে শুধু ফ্রক তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। দরকারে সারা জীবন।

কী পারছ না!

না। কি ভাবে লাগালি। দ্যাখ না ছিঁড়ে ফেলতে পারিস কি না।

চেষ্টা তো করেছি। পারলাম কৈ। যদি তুমি পার।

যদি তুমি পার মানে? ইন্দ্র দড়ির নিচে হাত ঢোকাবে কি করে। দড়িটাতো শক্ত মুঠোয় চেপে ধরতে হবে। তবে যে সেই পবিত্র ইচ্ছার ক্ষেত্রটি তার হাতের ছোঁয়া টের পাবে। সে না পেরে বলল, দেখছি।

লাবণ্য তেমনি ফ্রক তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

নির্জন প্রকৃতির মধ্যে কিছু জোনাকি, দূরে শেয়ালের হুক্কা হুয়া। আরও দূরে সেই নিরন্তর গাছপালার আবছা অস্পষ্ট ছবি। সামান্য কুয়াশারও স্পর্শ রয়েছে জ্যোৎস্নায়। সে হাত দিতেই টের পেল, উলের মতো নরম উষ্ণতার স্পর্শ। সে কেমন কিছুটা কাতর হয়ে পড়ছে। চোখে মুখে জ্বালা, কান গরম, গরম নিঃশ্বাস পড়ছে। সে টেনে ছিঁড়তে পারল না। তার মাথায় রাজ্যের কুচিন্তা। সে স্থির থাকতে পারছে না। লাবণ্য বলল, দেখ না, দাঁত দিয়ে গিঁট খুলতে পার কি না। নোখে তো পারলে না।

আসলে জানুদেশে মুখ না ডুবিয়ে দিলে গিঁটে সে দাঁতের কামড় বসাতে পারবে না।

সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কী হল!

চল বাড়ি। ছুড়ি দিয়ে কেটে নিবি। পারছি না।

চেষ্টা না করেই বলছ, পারবে না! তুমি সত্যি মানুষ একখানা! মানুষ না অপদেবতা তাও বুঝি না! অতটা যেতে পারব না। সব ভিজে যাবে।

ভিজুক।

ভিজুক! আমার ঘেন্না করবে না!

ইন্দ্র অসহায়ের মতো আবার হাঁটু গেড়ে বসল। মুখ ডুবিয়ে দিল নাভিমূলে। দাঁত দিয়ে গিঁট আলগা করার চেষ্টা করছে। নোখে যা হয়নি, দাঁতে তাই যেন ক্রমশ আলগা করতে পারছে।

আর টের পাচ্ছে, লাবণ্য কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছে। মুখের ভিতর জানুদেশ এতটা প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যে তার নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। লাবণ্যর যেন হুঁস নেই। সে দেখতে পাচ্ছে জংঘা গড়িয়ে কিছু নামছে। তবে কি তার প্যান্ট নষ্ট হয়ে গেল। তার মাথায় হাত চেপে, নিজেই কেমন আলগা হতে হতে একসময় বালির প্রান্তরে শুয়ে পড়ল।

লাবণ্যর আর সাড়া নেই।

বিবশ এক তরুণী বালিকার ভিতর সৃষ্টি রহস্যের এমন আবির্ভাব হতেই পারে ইন্দ্র জানবে কী করে! কেমন অসাড়। হাত টানলে হাত উঠছে। ঠেলে দিলে পাশ ফিরছে। কিন্তু আর কিছু হচ্ছে না।

এমন কি লাবণ্য যেন ভুলেই গেছে, এটা একটা নির্জন বালির প্রান্তর। কেউ নেই—রাত গভীর, তার মতো বালিকার পক্ষে এ-ভাবে একজন তরুণের সামনে পড়ে থাকা যে ভারি অশোভন তাও লাবণ্যর মাথায় নেই। কেমন ঘোরে পড়ে যাবার মতো।

সে ডাকল, লাবণ্য তোর সত্যি শরীর খারাপ! কি যে করি! প্যান্টের দড়ি খুলে দিয়েছি। ওঠ।

কিন্তু লাবণ্য উঠল না। শুধু হাতটা বাড়িয়ে দিল।

ইন্দ্র হাত ধরলে কোনোরকমে প্যান্ট সামলে উঠে দাঁড়াল। বলল, আমাকে ধর।

সে ধরলে ফ্রক তুলে প্যান্টের ফসকা গেড়ো বেঁধে দিল। ফসকা গেড়ো অন্ধ গেড়ো হয়ে যায় কেন ইন্দ্র জানে না।

লাবণ্য কিছুক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। যেন দম নিচ্ছে। তারপর বলল, চল।

॥ আট ॥

গাড়িটা স্টেশনে থেমে আছে। লোকজন নেমে যাচ্ছে। পাশের যাত্রীটি তাকে বসে থাকতে দেখে কী যেন ভাবল। তারপর প্রায় ঠেলা মেরে বলল, আপনি যাবেন কোথায়!

কোথাও কি কোনো গভীর আত্মমগ্ন মানুষের ছবি আবিষ্কার করে ফেলেছে তার পাশের যাত্রী! কথা বলছে না! চোখ বুজে বুঁদ হয়ে আছে। কোনো কি অস্বাভাবিক আচরণ তার ভিতর লক্ষ্য করেছিল—কিংবা যে মানুষ ট্রেনে উঠে বসে, তার তো কোথাও না কোথাও নেমে যাবার কথা থাকে। কিংবা সে যে খুব বিচলিত তা টের পেয়ে গেছে কামরার যাত্রীরা! কে কোথায় যাবে, এমন প্রশ্নের মুখে ইন্দ্র তার স্টেশনের নাম বললে, যাত্রীটি আরও বেশি কৌতূহল দেখাল।

আরে মশাই নামুন। গাড়ি তো ছেড়ে দেবে।

হুঁস ফিরে এল ইন্দ্রর।

সে তাড়াতাড়ি এটাচি হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ট্রেন থেকে নেমে গেল।

সে কি করে যে ভুলেই গেছিল, পকেটে হিরণের চিঠি—সে যাচ্ছে, লাবণ্য নামে এক নারীর খোঁজে। তার আর কোনো আবিষ্কার নেই, একমাত্র লাবণ্যকে খুঁজে বের করা ছাড়া।

অথচ আশ্চর্য, স্টেশনে নেমেও সে কেমন ঘোরে পড়ে গেল। তার এই নিমগ্ন হওয়া কোথাও কোনো কূট জীবন মহিমার কথা বলে থাকতে পারে—তার কামড় বড় সুতীক্ষ্ণ। সে নিজের মধ্যে ছিল না বুঝতে পেরে কিছুটা যেন বিব্রতই হয়ে পড়েছে।

সে সোজা নেমে গেট পার হয়ে গেল। ট্রেন হুইসিল দিল। সে সিঁড়ি ধরে নিচে নামছে। বুকে আবার তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। একটা রিকসায় উঠে বসল। দাম দর করল না। শুধু বলল, মিলের গেট।

সে শহরটায় এসেছে, ঘুরেছে, কিন্তু আজকের এই ভ্রমণ তার কাছে কোনো গভীর ক্ষতচিহ্নকে ফের উদ্ধার করে নিজের বুকে বহন করার তাগিদ। এই তাগিদ থেকে সে রিকসায় বসেও ঠিক খেয়াল করছে না, কোন রাস্তায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে রিকসাওয়ালা। মিলের গেটে যাবার দুটো রাস্তা আছে, একটা নতুন বাজার হয়ে, আর অন্যটা সামনের রেল গুমটি পার হয়ে কাচা সড়ক ধরে। রেল গুমটিতে গেলে দেরি হতে পারে, কখন রেল গেট বন্ধ হবে খুলবে কেউ জানে না। এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে জীবনের সব শুরু অথবা আরম্ভ এবং রেলগেটে রিক্সা

দাঁড়িয়ে থাকলেও তার এমন মনে হয়। ও রাস্তায় না গিয়ে ভাল করেছে। একটু ঘুরপথে গেলেও সে তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে। কারো মর্জির অপেক্ষায় তাকে রিকসায় চুপচাপ বসে থাকতে হবে না।

এটা তার নিজের মর্জি—অপেক্ষা নিজের জন্য। কারো জন্য যাচ্ছে না—এ-সময় কেন যে মনে হল, সে নিজের খোঁজেই বের হয়ে পড়েছে। যা ছিল এতদিন সুপ্ত বাসনা আজ তা বড় বেশি খোলামেলা।

যদি গিয়ে শোনে লাবণ্য কোষ্ঠি বিচারে মৃত্যু যোগেরই শিকার! তবু সে জানবে লাবণ্য নেই। সে আর এক দুঃসহ ভার। তবে কাল মানুষের সব শোকতাপ হরণ করে নেয়। লাবণ্যর জন্য কষ্ট স্মৃতি হয়ে থাকবে। একটা ফটো তখন তার বড় দরকার। তার দেয়ালে সে ছবি হয়ে থাকবে। সেটাও জীবনের পক্ষে পরম পাওনা।

যদি লাবণ্য ঘর সংসার করে, করতেই পারে—আর তাই স্বাভাবিক—সে বোকার মতো নিজেকে কষ্ট দিলে লাবণ্য কী করতে পারে। সেখানে গিয়েও সে লাবণ্যকে একবার দেখে আসবে।

'খুব বিপদ' হিরণের হলেও তার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না। ঝানু সাংবাদিকের পক্ষে, অনেক কাজই সহজ। কাগজের লোক হলে কিছুটা সুযোগ সুবিধা পেয়েই থাকে। যখন সর্বত্র দুর্নীতি, স্বজনপোষণ তখন হিরণের কাছে কোনো কারণে সে খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। খুব বিপদ এ দুটো শব্দ নানা অর্থে তার কাছে এখন হাজির। তবু কেন যে ইচ্ছে হচ্ছিল, এই বিপদের সঙ্গে লাবণ্য জড়িয়ে থাকুক। সে তবে অন্তত বিনিময়ে কিছু দিতে পেরেছে লাবণ্যকে, এমন সান্ত্বনা থাকবে।

কোর্ট রোড পার হয়ে পুলিশ লাইন, তারপর জলের ট্যাংক—আরও এগিয়ে গেলে জেলখানার পাঁচিল—বড় বড় শিরিষ গাছ এবং লোকজন, গরুর গাড়ি, সাইকেল রিকসার ভিড়। শহরের শেষদিকে ঝিল, সাঁকো পার হয়ে মিলের লম্বা পাঁচিল। মিল গেটে নেমে দেখল, পর পর চা-এর দোকান, মনিহারির দোকান। তারপর যে মাঠ সামনে, সেখানে নতুন সব ঘরবাড়ি। রাজবাড়ির মাঠটা তবে বিক্রি হয়ে গেছে। তিন-চার বছর আগে মাঠটায় কোনো লোকালয় ছিল না। বেশ পরিবর্তনের ছাপ।

শীতল ভট্টাচার্য। কেয়ার অফের জায়গায় নামটা লেখা আছে। হিরণের কেউ হবে। লাবণ্যরও হতে পারে।

সে রিকসা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল। সে যে বেশ ক্লান্ত এবং অবসন্ন

তার চলাফেরায় ধরা পড়ছে। তবু সে তেজি ঘোড়ার মতো কদম দেবার চেষ্টা করছে। ট্রেন যাত্রায় সে কখনও কাহিল হয় না। বসে বসে ঘুমিয়ে নিতে পারে। কিন্তু আজ ভিতরে তার ঝড় গেছে—তাণ্ডব বলা যেতে পারে। তার প্রতিক্রিয়া চোখে মুখে বোধহয় স্পষ্ট ছাপ ফেলে গেছে। সে ঘেমে গেছে। নোনা উঠেছে শরীরে। জামা ঘামে ভিজা। চটচট করছে শরীর। চান করতে পারলে ফ্রেস হওয়া যেত। এসেই তো গেছে।

নাম বলতেই একজন বলল, শীতল ভট্টাচার্য ! মিলের উইভিং মাস্টার ! যান এগিয়ে যান—ওই দেখছেন পাঁচিল শেষ, পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে। পুকুর পাবেন। ওখানে কাউকে বললে বাড়িটা দেখিয়ে দেবে।

সে সোজা হেঁটে গেল। পাঁচিল পার হল। ঘাটলা বাঁধানো পুকুর। জল তলানিতে নেমে গেছে। কিছু পদ্মপাতা চোখে পড়ল। শহর জায়গার কাছে গ্রাম মতো—এ ওর বাড়ি সহজেই চেনে।

হিরণদের বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। বেশ বড় জায়গা নিয়ে একতলা বাড়ি। সামনে লন। কোমর সমান পাঁচিল। গেটের দু পাশে কাঞ্চনফুলের গাছ। গাছগুলো বড় নয় আবার ছোটও নয়। গেটে দাঁড়াতেই মনে হল দরজা খুলে কে ছুটে আসছে !

হিরণ।

এক যুগ পরেও হিরণ পাল্টায়নি। শুধু সামান্য লম্বা হয়েছে। সেই ঋজু সুন্দর মুখ—অথচ মুখে কিছুটা বিষণ্ণতা। তাকে দেখে হিরণ এক পলকেই চিনতে পেরেছে। বোধ হয়, রোজ হিরণ ট্রেন আসার সময়, কিংবা ট্রেন চলে গেলে, জানালায় দাঁড়িয়ে থাকত তার প্রতীক্ষায়। না হলে গেটে এসে দাঁড়াতেই হিরণ টের পাবে কী করে ইন্দ্রদা হাজির। হয়তো হিরণ সব ট্রেন চলে গেলেই প্রতিদিন এ-ভাবে তার জন্য অপেক্ষা করেছে।

হিরণের মাথায় সিঁদুর। হাতে শাখা। সোনার বালা।

সে বলল, আরে কী ব্যাপার !

যেন কিছুই হয়নি ! হঠাৎ তোমাদের চিঠি, কী ব্যাপর। কোথায় এতদিন ডুব মেরে ছিলে এমন বলার ইচ্ছে।

হিরণ হাতের ব্যাগটা হাত বাড়িয়ে নিতে গেলে বলল, খুব ভারি না। চল।

না দাও।

হিরণ জোরজার করেই ব্যাগটা যেন কেড়ে নিল। বলল, জানতাম তুমি আসবে।

কিন্তু সে তো জানতে চায় 'খুব বিপদটা' কি ! সে-সম্পর্কে হিরণ তাকে কিছু বলছে না। যেমন আত্মীয় বাড়ি এলে হৈ চৈ-প্রিয় হয়ে ওঠে সবাই, হিরণের আচরণেও তেমন আভাস।

হিরণ পরেছে সুন্দর লতাপাতা আঁকা শাড়ি, হলুদ ব্লাউজ। চান করে উঠে ভিজা চুলে অপেক্ষা করছিল। ট্রেন গেলে সে কি বাথরুমে ঢুকে স্নান করে নেয়। কেউ আসবে। দুপুরের ট্রেনেই আসার কথা। এই ট্রেনটাই সবচেয়ে বেশি সুবিধার। সব স্টেশন ধরে না।

ট্রেন লেট ছিল !

জানি না। কটায় আসার কথা !

লেট ছিল। দুটোয়।

ইন্দ্র বলল, হবে।

দরজায় কলাপ্সিবিল গেট। অবাক, এই দিনের বেলাতেও গেট বন্ধ। এবং তার মনে হয়েছিল, তালা খুলে হিরণ গেট টেনে দিয়েছে। সে ঢুকলে, আবার টেনে দিল—এবং তালা মেরে দিল।

রুচিবোধ বাড়িটায় ঢুকেও ইন্দ্র টের পাচ্ছে। নতুন রঙ করা। দেয়ালে কোনো দাগ নেই। বাড়িটার মাঝখান দিয়ে করিডোর গেছে। এক পাশের ঘরগুলির দরজা বন্ধ। সামনের ঘরটা খোলা। দেয়ালে হিরণের বাবার ছবি। মাথায় হ্যাট গায়ে কোট, গলায় টাই। রাশভারি চেহারা। ছবিটা প্রমাণ সাইজের চেয়ে অনেক বড়।

ঘরেও একটা টেবিলে তার বাবার ছবি।

আর কোনো ছবি দেখতে পেল না। দেয়ালে বড় বড় সব ছবি আছে—তবে সবই দামী ক্যালেন্ডার থেকে কেটে নেওয়া। ঘরে মৃদু সৌরভ। কিছু যেন কেউ এই মাত্র স্প্রে করে দিয়ে গেছে।

হিরণ বসার ঘরে ঢুকে বলল, চান-টান সেরে ফেল। আমার জন্য তোমার এই দুর্ভোগ। তুমি ব্যস্ত মানুষ—

হঠাৎ কেন যে ইন্দ্র ক্ষেপে গেল !

আমার জন্য বলায় ক্ষেপে গেল।

সে বলল, দুর্ভোগ যখন না লিখলেই পারতিস ! লিখতে গেলি কেন খুব বিপদ।

হিরণ বুঝল, না ইন্দ্রদা পাল্টায়নি। যতই নামী মানুষ হোক, কাগজে তার এডিটরিয়েল পেজে মাঝে মাঝে অগ্নিগর্ভ লেখা প্রকাশ পাক, এমন কি কখনও

খবরের আগে লেখা থাকে—তার নাম। কারণ এই নামের লেখা পাঠকদের কাছে নানা কারণে হয়ত গুরুত্ব পেয়ে যায়—তার মতো মানুষ যে চিঠি পেয়ে ছুটে আসবে, তার চিঠির এতটা গুরুত্ব দেবে আন্দাজ করতে পারেনি।

হিরণ আর কথা বাড়াল না। শুধু বলল, চাবিটা দাও।

ইন্দ্র ভিতরে ছটফট করছে।

হিরণ হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে। এটাচি খুলে পাজামা পাঞ্জাবি বের করল। ইন্দ্র এতটা লম্বা চওড়া মানুষ, আর এত সুপুরুষ এই বয়সে যে, যেন অন্য কোনো জামা কাপড়েই তাকে মানাবে না। মাপে ছোট হবে।

ইন্দ্র বলল, পাখাটা বাড়িয়ে দে।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেল হিরণ। হাতে সোনার বালা এবং ভিজা চুলের অন্য কোনো সুঘ্রাণ থাকে। লাবণ্য ইচ্ছে করলে আজ ঠিক এ-ভাবে ছুটে আসতে পারত। বুকটা তার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

মাসিমাকে দেখছি না!

হিরণ সাড়া দিল না। কাজের মেয়েটাকে ডেকে বলল, দাদাবাবুর জল দাও বাথরুমে।

আসলে বাড়িটা নতুন। কল থেকে জল টেনে তুলতে হয় বাথরুমে। শেষদিকটায় সম্ভবত বাথরুম। শেষদিকটায় আর কি আছে সে জানে না। সে উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। দূরে রাজবাড়ির ভগ্ন প্রাসাদ—জানালায় দাঁড়ালে চোখে পড়ল—রাজবাড়ির সেই বৈভব স্তিমিত। রাজার বংশধরেরা কলকাতায় থাকে। রাজামহারাজারা কেমন আছেন স্বাধীনতার এক যুগ পর তার উপর একবার সে পর পর কটা স্টোরি করেছিল।

সে জানে রাজার বংশধররা এখানে থাকেন না। দোল দুর্গোৎসব বন্ধ। রাসের মেলা বসত। তাও বসে না। বাড়ির এক একটা দিক বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। কড়ি বরগা সব খসে পড়ছে।

লাবণ্যর জীবনে কড়ি বরগা ঠিকঠাক কতটা আছে কে জানে। আদৌ আছে কি না—অথচ সোজাসুজি সে বলতেও কেন পারছে না, লাবণ্য কোথায়। এত দ্বিধা কেন লাবণ্যকে নিয়ে সে বুঝতে পারছে না—মাসিমাকে দেখছি না বলে সবে শুরু করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে হিরণ অদৃশ্য। কোনো জবাব দিল না।

খুব বিপদটা কি, আদৌ সে বুঝতে পারছে না। এতে সে আরও বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেশি চঞ্চল হয়ে উঠলে পর পর সিগারেট জ্বালায়। টানে। কিছুটা টেনেই কেমন বিরক্ত লাগে। ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সে ঘরের মধ্যে পায়চারি

করছিল।

আর তখনই হিরণ দরজায় এসে দাঁড়াল।

যাও। জামা প্যান্ট বাথরুমে রেখে দিয়েছি।

সে আর পারল না। বলল, চান খাওয়া বড় নয় হিরণ। তোর কি বিপদ, মাসিমা লাবণ্য কোথায়, মেসোর খবর, কিছুই বলছিস না। কর্তা তোর কোথায়।

কর্তা মিলে। ছ'টায় ফিরবেন। সিফ্ট ডিউটি।

লাবণ্য?

হিরণ মাথা নিচু করে বলল, সব বলব। ডেকেছি সাধে! আমি আর পারছি না!

হিরণ সত্যি খুব ভেঙে পড়েছে। হিরণ কাঁদছে চৌকাঠ ধরে।

কোনো বড় বিপর্যয়ের মধ্যে না পড়লে মানুষ এতটা ভেঙে পড়ে না। ইন্দ্র স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। কান্না বড় ছোঁয়াচে রোগ।

খাওয়া দাওয়া সেরে ইন্দ্র দেখল, হিরণ তার জন্য বিছানা করে রেখেছে। মশার উৎপাত আছে। নেটের মশারি টাঙানো।

ইন্দ্র বলল, দিনে ঘুমাই না।

একটু বিশ্রাম কর। কতটা পথ এসেছ!

তার এত অস্বস্তি, অথচ কত সহজে হিরণ বলল, একটু বিশ্রাম কর। সেতো এই করে বেড়ায়। এতে তার খুব একটা ক্লান্ত হবার কথা না। অথচ একসময় মনে হয়েছিল, শরীরে জোর পাচ্ছে না। হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে যেন। এবং সে ঘরে না ঢুকে বলল, তুই বরং শুয়ে নে। বলে সে তার এটাচি খুলে বই খুলতেই হিরণ আর পারল না।

বলল, দিদি পাগল হয়ে গেছে!

কোথায় লাবণ্য! বিদ্যুৎ চমকের মতো ছোবল মারলে যা হয়, ইন্দ্র সোজা হয়ে দাঁড়াল, আবার বসে পড়ল।

ওদিকের ঘরে।

আমি দেখতে পারি!

পার। তবে এখন না। উনি না এলে হবে না। খুব ভায়লেন্ট হয়ে পড়ছে আমাকে দেখলে।

কবে থেকে!

সে যে কবে থেকে বলব কী করে?

তার মানে!

মানে অনেক—মানে অনেক ইন্দ্রদা। আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।

ইন্দ্র ভাবল, যাক, লাবণ্য বেঁচে আছে। এটাই তার কাছে বড় ভরসা। সে যেন বেশ হালকা হয়ে গেছে। শেষ হয়ে যায়নি। গাছটা মরে যায়নি। তার সার জল দরকার, গাছ থেকে পাতা ঝড়ে গেছে—বরফ পড়ছে, তুষারপাতে ন্যাড়া ডালে পেঁজা তুলোর মতো বরফ জমেছে—গাছটা মরে যায়নি।

সে কেমন কিছুটা বিড় বিড় করে বলল, গাছটা মরে যায়নি।

হিরণ সামনের সোফায় বসে আছে।

বলল, কিছু বলছ!

ইন্দ্র মুখ তুলে তাকাল। সে নিজের সঙ্গে কথা বলছে—হিরণ টের পায় কী করে। ইন্দ্র বলল, না, কিছু বলছি না।

ডাক্তাররা বলছে, লস্ট কেস। হিরণ বলল।

ইন্দ্র বলল, ওর প্রব্লেমটা কি! যেন ইন্দ্র একজন দক্ষ সাইকিয়াট্রিস্ট। ইন্দ্র এমন বলার পর কিছুটা সংকোচে পড়ে গেছে। লাবণ্য বেঁচে আছে, লাবণ্য ঘর সংসার করেনি এগুলো যতটা মর্মান্তিক খবর—পাগল হওয়াটা তার তুলনায় কিছু না। সে স্বার্থপরের মতো আচরণ করছে। তারপর বেশ হালকা গলায় বলল, আমরা তো আছি। লস্টকেস বললেই মেনে নেব কেন!

ইন্দ্র আসায় হিরণ যেন সত্যি জোর পেয়ে গেছে। সে কিছুটা স্বাভাবিক গলায় বলল, যাই হোক কিছু করতে হবে। উনি মানসিক আশ্রমে দিতে চাইছেন। বেশ ভাল আশ্রম। রুগীদের যত্ন-আত্তি হয়। কিন্তু ওখানে সিট পাওয়া কঠিন। তুমি তো ইচ্ছে করলে পার।

সে দেখা যাবে। এক কাপ চা দিতে বল।

অবেলায় চা। এই তো ঘণ্টাখানেক হল সে চা খেয়েছে। এখন চা!

ইন্দ্র বলল, মানুষের কোনো নেশা না থাকলে বাঁচার আগ্রহ থাকে না। চা যখন তখন খেতে পারি।

হিরণ নিজেই পটে গরম জল, চা চিনি দুধ ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এল।

ইন্দ্র বলল, মাসিমার খবর কি? কোথায় আছে।

বাবা তো শিলং-এ মারা গেলেন। আমরা জ্যাঠার বাড়িতে। মা তিন মাস বিছানায় শুয়েছিলেন। সে যা গেছে!

লাবণ্য কোথায়!

পাশের ঘরে।

ইন্দ্র বুঝতে পারল, এর জন্য ঘরটায় বাইরে থেকে লক করা। চল একবার দেখি। যেন সে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে দেখার জন্য আগ্রহ বোধ করছে। তার বেশি না।

আমি একা সামলাতে পারব না।

আমি তো আছি।

তোমাকে চিনতে পারবে না।

না চিনুক। চল তো।

হিরণ যেন সাহস পাচ্ছে না। মুখ কেমন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। সে বুঝল, না দরকার নেই। লাবণ্য এ-বাড়িতেই আছে। লাবণ্য আছে—বেঁচে আছে, তার বেঁচে থাকা এবং নিখোঁজ লাবণ্যকে সে শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পেরেছে এটাই তার কাছে এখন বড় সুখবর। সে আর পীড়াপীড়ি করল না।

হিরণ বলল, বাবা মারা যাবার পর দিদি কেমন হয়ে গেল। কথা বলত না। খেত না। বাবা তো তার পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন। আমরা তখন শিলচরে। বাবা অফিস থেকে ফিরে এলেন জ্বর গায়ে। তারপর খুস খুস কাশি। কাকারা এলেন। জ্যাঠামশাই এলেন—গৌহাটির বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। বাবাকে শিলং-এ রাখতে গেলেন ছোট কাকা। আমরা বাড়িতে। মা রোজ আশা করতেন কোনো সুখবর আসবে। দিদি রোজ বলত, আমার বাবা কোথায়! তাকে তোমরা কোথায় নিয়ে গেলে! কবে আসবে। অসুখটা কি আমাদের জানানো হয়নি। মাকেও না। দিদি সারাদিন বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকত। ব্যাসিনজার পায়ের কাছে। কুকুরটাও কেমন মনমরা হয়ে গেল।

এক নিঃশ্বাসে বলে গেল হিরণ। পটে চা-চিনি দিয়ে নাড়ছে। লিকার ঢেলে দুধ মিশিয়ে প্লেট তুলে দিল ইন্দ্রর হাতে।

ইন্দ্র বলল, চায়ের ফ্লেবারটা দারুণ।

ইন্দ্র আর কিছু জানতে চায়ও না যেন। সে প্রতীক্ষা করছে হিরণের বর কখন ফিরবে। ঘড়ি দেখল।

আমার খোঁজ পেলি কি করে?

বাঃ, তোমার খোঁজ পাব না কেন!

কবে পেলি!

আমরা জানতাম, আমাদের ইন্দ্রদা বড় কাগজে আছে।

কে খবর দিল। অন্য ইন্দ্রদা হতে পারত।

তোমার ছবি বের হয়েছিল। খবরের জন্য কারা যেন তোমাকে পুরস্কৃত করেছিল। চিনতে দেরি হয়নি।

ওকে কলকাতায় দেখিয়েছিস ?

উনি তো নিয়ে গেছিলেন। তারাও বলেছেন, লস্ট কেস। যতদিন বেঁচে থাকে !

বেঁচে থাকে ! ভাবতেই ইন্দ্রর মনে হল, লাবণ্য এখন গলগ্রহ এদের। অবশ্য একজন পাগল সংসারে কতভাবে উৎপাত করতে পারে এবং পরিবারের মানুষজনকে অস্থির করে তুলতে পারে হিরণকে দেখে টের পেয়েছে। লাবণ্যর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উন্মাদ আশ্রমের কথা ভাবা হচ্ছে। হিরণকেও তার এখন কেন জানি স্বার্থপর মনে হচ্ছে। নিজের দিদিকে কোন উন্মাদ আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

হিরণ বলেই যাচ্ছে।

বাবা মারা যাবার পরই প্রচণ্ড ডিপ্রেসান। আরও গোলমালে পড়ে গেলাম— ব্যাসিনজারকে মেরে ফেলার পর। দিদির বড় প্রিয় কুকুর। ব্যাসিনজার যাও অবলম্বন ছিল দিদির, তাকেও মেরে ফেলা হল।

কেন !

বাবাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি। কেউ আমরা খোঁজ নিতাম না ! কি খেল, কি খেল না। কুখাদ্য খেয়ে বেড়াত। লাগামছাড়া। মা বিছানায়। দিদি চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যাসিনজারের গা থেকে সব লোম ঝড়ে পড়ে গেল। চাকা চাকা দাগ। ঘা। ছোটকাকা কুকুরটাকে বিলের ধারে খাবারের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। গুলি করে মেরে ফেলা হল। দিদি খবরটা পেয়ে ছুটে গেছিল। তখন সব শেষ। মুখ থেকে কুকুরটা রক্ত ওগলাচ্ছে।

ইন্দ্র ভারি বিমর্ষ। ওর অ্যালবামে সেই কুকুরের ছবি—যেন কোনো নিরপরাধ হরিণ শিকারের মতো। মেয়েটার মধ্যে পাপবোধ ছিল প্রখর। চলে যাবার আগে দাদুর শ্মশানে তারা প্রদীপ দিতে যেত। লাবণ্য হিরণ মঞ্জু সবাই। কোনো কোনো দিন লাবণ্য একা থাকত। ছাড়াবাড়িতে দাদুকে দাহ করা হয়েছিল। ইট সিমেন্টের বেদি। তাতে তুলসিগাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রদীপ জ্বালাবার পথেই একদিন কী যে হয়ে গেল। অন্ধকার। লাবণ্য গা ঘেসে হাঁটছে। লাবণ্যর বাবা চিঠি দিয়েছে, তাদের নিতে আসবে। যেন সে জানত, ইন্দ্রদার সঙ্গে তার জীবনেও আর দেখা হবে না। প্রায়ই সে ঘাসের উপর শুয়ে থাকত। অন্ধকার হয়ে গেলেও ফিরতে চাইত না এবং সে হাত টেনে বাড়ি

নিয়ে আসত।

ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে।

যা হয়। সমবয়সী তরুণ তরুণীর যা হয়ে থাকে। তারও সেদিন কেমন হুঁস ছিল না। তার সংযম এবং অস্থিরতা গোলমাল পাকিয়ে তুললে লাবণ্যর কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারেনি।

আর অবাক, তারপরই লাবণ্যর কান্না। কেবল বলছে, পাপ করে ফেললাম ইন্দ্রদা। তোমাকে যদি না ফিরে পাই।

আসলে হিন্দু নারীর সেই চিরন্তন পাপবোধ এবং সংস্কার লাবণ্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। কোথায় যে থাকে বিন্দুবৎ পাপবোধ এবং ধীরে ধীরে তা বিস্তার লাভ করে—পরে তারই অনুশোচনা—লাবণ্য সেই অনুশোচনায় অস্থির হয়ে পড়তে পারে।

বাবার মৃত্যু, ব্যাসিনজারের মৃত্যু, সেই পাপবোধ থেকে লাবণ্যকে তাড়া করতে পারে।

একজন মনস্তত্ত্ববিদের কাছে কখনও তো কেউ এ-সব বলেনি। কিংবা জীবনে গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকা যে বড়ই মর্মান্তিক বিষয়—সে তো নিজের জীবনে সেটা টের পেয়েছে। অনাদর লাবণ্যকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে পারে।

সে বেশি কিছু জানতে আর চায়ও না।

হিরণের বর গম্ভীর প্রকৃতির। অথবা লাবণ্যকে নিয়ে যে তারা অসুখী চোখ মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়। কোনো উন্মাদ আশ্রমে দেবার পরিকল্পনা যে তাঁরই—কারণ, বিবাহীত জীবনে স্ত্রীর উন্মাদ শ্যালিকাকে কে আর ঘরে রাখতে চায়। তাকে দেখে হিরণের বর খুব খুশি।

যাক এসে গেছেন। ভাবছিলাম কার এত দায় পড়েছে যে খবর পেয়েই ছুটে আসবে। সম্পর্কেরও তো তেমন জোর নেই। কী বলেন !

ঠিকই বলেছেন। সম্পর্কের জোর কোথায়। তবে কোথায় কার শেকড় কিভাবে পুঁতে যায় আমরা জানি না। চলুন।

কোথায় !

লাবণ্যকে দেখব।

দেখেননি !

না।

ওকে তো ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছি।

তাতে কি হয়েছে !

খুব সন্তর্পণে ভদ্রলোক দরজার দিকে হেঁটে গেল। দরজা খুলল। সারা ঘরে ভ্যাপসা গন্ধ। জামা শাড়ি মলিন। চাদর যেন কত দিন পাল্টানো হয়নি। লাবণ্য ঘুমিয়ে আছে।

ইন্দ্র হাঁটু গেড়ে বসল। মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিল। নারী তার সব হারিয়ে ফেললে এই হয়। সাদা মমির মতো শুয়ে আছে। গলা পর্যন্ত চাঁদর ঢাকা। পাশের জানলাগুলি বন্ধ। ইন্দ্র উঠে গিয়ে জানলা খুলে দিতে গেলে হঠাৎ দেখল ভদ্রলোক তার হাত টেনে ধরেছে।

সে তাকাল। অবাক। এমন ভ্যাপসা ঘরে থাকলে যে কেউ পাগল হয়ে যেতে পারে।

সে বলল, কি হল!

খুলবেন না। আলো সহ্য করতে পারে না।

দেখি না পারে কি না!

ইন্দ্র জোর করেই প্রায় জানলা খুলে দিয়ে আবার শিয়রে এসে বসল। শরীরের লাবণ্য মরে গেলে নারী বড়ই অপ্রিয় হয়ে যায়। লাবণ্যর কিছুই নেই। দেখে মনে হল, হাঁটাচলাও করতে পারবে না।

সে ধীরে ধীরে বাইরে বের হয়ে এল।

ডাকল, হিরণ!

ওর তো কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভায়লেন্ট হয় কি করে!

সেই তো। হিরণ বলল।—কি করে হয় বুঝি না। তখন এত জোর পায় কি করে বুঝি না!

ঠিক আছে। একটা ট্রাংকল বুক কর। কলকাতায়। বলে সে ডাইরি খুলে নম্বরটা দিল।

রাতে ট্রাংককল।

কে, সুমিত বলছিস!

হ্যাঁ। তুমি হঠাৎ বেপাত্তা। অফিসে এসে শুনি, তুমি নাকি কোথায় যাচ্ছ। ফিরতে দেরি হতে পারে! কী ব্যাপার!

তোর ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়েছিস!

না। নন্দিতা রাজি হচ্ছে না।

আচ্ছা শোন, ফ্ল্যাটটায় আমি গিয়ে উঠব। কিছু দিনের জন্য। নন্দিতাকে বলবি। খুব জরুরি।

তুমি ফ্ল্যাটে থাকবে! তা হলেই হয়েছে। তুমি না বলতে একা কেউ ফ্ল্যাটে

থাকতে পারে!

একা না!

তবে মাসিমা আসছেন!

না না। তুই এক কাজ করবি ভাই, সল্টলেকের দিকে তোর যে ঘরটা আছে ওখানে একটা সিঙ্গল খাট রাখবি। ঠিক জানলার পাশে। বুঝলি কিছু! সকালেই সব ঠিক করে রাখবি।

না দাদা, আমার মাথায় আসছে না।

আমার এক আত্মীয়া অসুস্থ। কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। বুঝতেই পারছিস, খুব বিপদে না পড়লে তোকে ট্রাংকল করতাম না। ভেবে দেখলাম তুইই পারিস আমাকে এত বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে।

কে হয় তোমার!

আমার যে কে হয়, এখনও ঠিক জানি না। আস্তে আস্তে হয়ত জানতে পারব। তোষক চাদর বালিশ সব রাখবি। আর্জেন্ট কাচিয়ে আনবি। স্টেশন থেকে সোজা সেখানে চলে যাব।

কবে আসছ!

তাও জানি না। এক দু-দিন দেরি হতে পারে। শুভময়দাকে খবরটা দিস। কিছু দিন হয়ত অফিস যাওয়া হবে না। মেডিক্যাল দিয়ে দেব।

সে এবার ফিরে এসে সোফায় গা এলিয়ে দিল। তার কথা বলতেও ভাল লাগছে না। হিরণেরও দোষ দিতে পারে না। হয়তো ভদ্রলোক হিরণকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল—লাবণ্যর মৃত্যু কামনাও করতে পারে। যত দ্রুত শেষ করে দেয়া যায়। এটা মনে হতেই কোথাও যেন রহস্যের গন্ধ পেয়ে সে হিরণকে ডাকল।

হিরণ এলে বলল, বোস।

ইন্দ্র গুম মেরে আছে। মিলের ঝম ঝম শব্দ কানে আসছিল। কাপড়ের মিল। ভদ্রলোক উইভিং মাস্টার। হিরণ কিছু কি গোপন করে যাচ্ছে। যেন সব জানা হয়নি। এ-ভাবে লাবণ্যকে সারাদিন ঘরে আটকে রাখা কেন! লাবণ্য জেগে গেলে সে গেছিল। নিজেই উঠে বসার চেষ্টা করছে। তাকে খেতে দেওয়া হবে। সে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। লাবণ্য তার দিকে তাকায়ওনি। তাকে চিনতেও পারেনি। হিরণ বলেছিল, ইন্দ্রদা। চিনতে পারছিস না দিদি। শুধু শূন্য দৃষ্টি ছাড়া লাবণ্যর মধ্যে জীবনের আর কোনো চিহ্ন নেই।

॥ নয় ॥

ইন্দ্র ক্ষুব্ধ। কিন্তু বেশি কিছু সে বলতে পারছে না। নিজের বোনের চেয়ে সে আপন,লোকে বিশ্বাস করবে কেন। সে বুঝল, হিরণ তার বরকে বাঘের মতো ভয় পায়। মানুষটি নামে এবং কাজে এক। শীতল ভট্টাচার্য। বেশ ঠাণ্ডা গলায় কথা বলেন। এমন কি হিরণ এখন সে একলা থাকলে ঘরে পর্যন্ত আসছে না। মানুষটা বোধ হয় সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। এখানে আসার পর হিরণের যে উষ্ণতা টের পেয়েছিল, শীতলবাবু অফিস থেকে ফেরার পর তাও গেছে। যখন তখন ডাকতে পারছে না। কাজের মেয়েটাকে পাঠিয়ে জেনে নিচ্ছে।

রক্ষা, শীতলবাবুর শিফট ডিউটি।

কিন্তু সে টের পেল, যতক্ষণ সে এ-বাড়িতে আছে—শীতলবাবু নড়বেন না। সতর্ক পাহারা।

সে কিভাবে কথাটা বলবে বুঝতে পারছে না।

শীতলবাবু·কোনো নেশা করেন না। টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত স্বভাবের মানুষ। তিনি তার সামনে বসে আছেন। খবরের কাগজ সম্পর্কে তার যে খুব ভাল ধারণা নেই তাও তিনি কথাবার্তায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ইয়েলো জার্নালিজম নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বললেন। তার কাগজ নাকি সেদিকেই ঝুঁকছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু অসার কথাবার্তাও ইন্দ্রকে হজম করতে হল।

সে মন দিয়ে শুনছেও না। লাবণ্যর ঘরে তার আজ থাকা দরকার। তা ছাড়া এ-অবস্থায় লাবণ্যকে নিয়ে যাওয়াও বেশ কঠিন।

সে বলল, শীতলবাবু যদি কিছু মনে না করেন!

না না, মনে করব কেন। সম্পর্কে শ্যালক, সম্পর্ক তো মধুর। বলুন। সব বলতে পারেন।

হিরণকে ডাকুন। ওরও শোনা দরকার। লাবণ্যর উপর তারই জোর বেশি।

হিরণ এসে ভাল করে গা ঢেকে বসল। শীতলবাবু ত্যারচা চোখে দেখল। দেখে কি বুঝল কে জানে, বলল, তোমাদের ইন্দ্রদা কিছু বলতে চান।

ইন্দ্র কেন যে জোর পাচ্ছে না।

সে বলল, একটা কাচা চাদর দরকার হিরণ।

কাচা চাদর!

হ্যাঁ কাচা পাটভাঙ্গা চাদর, ওয়াড়। লাবণ্যর বিছানা নোংরা। তুই যদি একটু সাহায্য করিস।

তুমি পারবে? কিছু পাল্টাতে দেয় না। স্নান করে না। জোরজার করলে

ভায়লেন্ট হয়ে পড়ে।

কই উঠেতো খেল! মুখ ধুল। তারপর শুয়ে পড়ল।

তখন তো সিডেটিভ ড্রাগ দেওয়া হচ্ছে।

তার মানে শরীর অবশ করে রাখা হচ্ছে!

তাই। কে করবে বল! আর পারছি না। কখনও চিৎকার করে ডাকবে, ব্যাসিনজার। কখনও বলবে, কখনও বলবে, আমার ঝিনুকের নৌকা কে নিয়েছে—বল, বল কে নিয়েছে! কাউকে ছাড়ছি না ইস সে কি চিৎকার, বাবা তোমার কি দরকার ছিল, হরিণটাকে মারার। বাবা বাবা। বাবা কোথায়! থালা গেলাস সব ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিছু মুখে দেবে না। চান করানো যায় না। জোরজার করে চান করাতে গেলে হাত কামড়ে দেয়। ঘুমের ওষুধ না দিয়ে কি করব?

ঠিক আছে। এখন তো ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিস। আমার সঙ্গে আয়।

শীতলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল ইন্দ্র, ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব। আপনাদের কোনো আপত্তি নেই তো।

না আপত্তি নেই। তবে আমরা চাইছিলাম কোনো মানসিক হাসপাতালে দিতে। কোনো আশা নেই। আপনি একা মানুষ সামলাতে পারবেন না।

সে দেখা যাবে।

ইন্দ্র ঘরের বাইরে বের হয়ে বলল, কি হল! হিরণ বসে আছিস কেন। আয়।

দ্রুত চায় ইন্দ্র লাবণ্যর ঘরে ঢুকে যেতে। সে দেখল আবার দরজা কে লক করে দিয়েছে। দরজা খুলে দেখল, ঘরে অন্ধকার। জানলা বন্ধ করে দিয়েছে কে।

হিরণ পাটভাঙ্গা চাদর ওয়াড় রেখে বলল, কি করবে?

দেখি কি করা যায়। রাত হয়ে গেছে। তোরা শুয়ে পড়গে। আমি লাবণ্যর ঘরে আছি। বসার কিছু দিতে পারবি! তারপরই কি ভেবে বলল, ওষুধ খায়!

না,খেতে চায় না। এক কথা, আমি তো ভাল আছি, ওষুধ খাব কেন! তোরা আমাকে মেরে ফেলতে চাস। উনি গিয়ে দাঁড়ালে ঠাণ্ডা মেরে যায়। ওষুধ হাতে নেয়। খায়।

ওর ঝিনুকের নৌকা তবে কেউ চুরি করে নিয়েছে। সে কে! সে কি ইন্দ্র নিজে! তার ভিতরে লাবণ্যর জন্য আরও বেশি তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। শোভন অশোভন জ্ঞানগম্যি পর্যন্ত নেই। সে ফের বলল, আমি রাতে এ-ঘরেই থাকব। শোব।

লাবণ্য ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে না তন্দ্রার মতো লেগে আছে বোঝা যাচ্ছে না। এ-ঘরে অল্প পাওয়ারের আলো, অন্ধকার লাবণ্যকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে।

আমাকে একটু সাহায্য করবি! ঠিক আছে তুই যা। কাজের মেয়েটাকে পাঠিয়ে দে।

হিরণ কেমন দ্বিধায় ভুগছে। বলল, আমি করছি। বল কী করতে হবে।

ইন্দ্র শিশুর মতো লাবণ্যকে কোলে তুলে নিল। বলল, চাদরটা পাল্টে দে। চাদর পাল্টালে সে লাবণ্যকে শুইয়ে দিল। হাল্কা পাখির মতো নরম উষ্ণতা ক্রমে যদি কোনোদিন ধীরে ধীরে জন্ম হয়। এবং কোমল ত্বকে থাকে এক আশ্চর্য যাদুর স্পর্শ। সে যেন বুঝতে পারছিল, ঘোরের মধ্যেও লাবণ্য টের পাচ্ছে, পরম মমতায় কেউ তাকে পাঁজা কোলে দাঁড়িয়ে আছে। সে চোখ মেলে দেখেছে পর্যন্ত। আবার কেমন ঘোরের মধ্যে ডুবে গেছে।

ইন্দ্র বালিশের ওয়াড় খুলে কাচা ওয়াড় পরিয়ে দেবার সময় বলল, ঘরে বেশি পাওয়ারের বালভ আছে? থাকলে দে।

ও সহ্য করতে পারে না।

পারবে। পারতে হবে। না পেরে যাবে কোথায়। থাকেতো দে।

ঘরের বালভ পাল্টে আলো জ্বালতেই বুঝল দেয়ালে ছাদে ঝুলকালি। বিকেলে দরজা খুলে যা দেখেছিল, এখন যেন আরও বেশি তা মনে হচ্ছে। সে হিরণকে বলল, একটা ঝাঁটা দিতে পারিস!

শীতলবাবু একবার উঁকি দিয়ে বলল, থাকতে পারবেন, মশাই আমিতো দুর্গন্ধে ঢুকতে পারি না।

দেখি পারি কিনা। চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই।

তা ঠিক, মানুষতো শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে। আমরাও করেছি। পারলাম না। দেখুন পারেন কি না।

ইন্দ্র বলতে পারত, চেষ্টা! একে চেষ্টা বলে! তার ক্ষোভ হচ্ছে লোকটার উপর। অমানুষ মনে হল। হিরণ আর এদিকে আসছে না। তারা ঘরে ঢুকে গেছে। দরজা বন্ধ করার শব্দও পেল। রাত বেশ গভীর। শুধু মিলের ঝম ঝম শব্দ ছাড়া তাবৎ পৃথিবী যেন নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। সে জানালার পাশে যেতেই মনে হল, গায়ে কিছু থাকা দরকার। গায়ের লেপটা নোংরা। তার ভুল হয়ে গেছে—কিন্তু ওরাতো জেগে নেই। এত বড় ভুল! সে গা থেকে লেপটা তুলে দেবার সময়, শাড়ি কিছুটা উঠে গেছিল দেখতে পেয়েছে। নিজেই টেনে দিয়ে

বলেছে, গরম পড়ে গেছে। এখন কেউ লেপ গায়ে দেয়! তোরা দিতে পারতিস! লাবণ্যর শাড়ি সায়া পাল্টানো দরকার। ব্লাউজ। তেল চিটচিটে। দেখল ঘাড় গলার নিচে চাপ চাপ নোংরা জমে আছে। চুল ছোট করে কাটা। বোধ হয় জোর করে তার চুল কেটে নেওয়া হয়েছে।

সে ঘরটা সাফ করছে। খাটের নিচ থেকে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ময়লা বের করল টেনে। এক কোণায় জমিয়ে রাখল। মশারির দড়ি মশারি সব পাল্টানো দরকার। রাতে এখনও ঠণ্ডা পড়ে এদিকটায়। অথচ লেপের ঠাণ্ডা নেই।সে তার ঘরে ঢুকে একটা পাটভাঙ্গা ধুতি এনে লাবণ্যর গায়ে টেনে দিল।

তবু ঘরের ভ্যাপসা গন্ধটা মরছে না।

সে শিয়রে জেগে বসে থাকল। তারপর ভাবল, এতে তার শরীর খারাপ করতে পারে। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে আরও বিড়ম্বনা বাড়বে। কিন্তু লাবণ্যকে একা রেখে তার কোথাও নড়তে ইচ্ছে করছে না। কাল সকালে গাড়ি যদি পাওয়া যায়—কিন্তু এত কম সময়ে সব ঠিকঠাক করে রাখতে পারবে কিনা, তাও এক দুশ্চিন্তা। কারণ লাবণ্যকে নিয়ে শুধু সে তার নিজের ফ্ল্যাটেই উঠে যেতে পারবে। আর যেখানেই যাবে,বলবে ইন্দ্রটা পাগল —একটা ভাগারের মরা নিয়ে কলকাতা শহরে এসে উঠেছে। পাগল না হলে সম্ভব না। ভাগারের মরা নিয়ে কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে!

ভাগাড়ের মরা—না না সে কি ভাবছে? সে এত খারাপ খারাপ কথা ভাবছে কেন। সে লাবণ্যর গালে গাল লেপ্টে দিল। বলল, আমি,লাবণ্য! আমাকে চিনতে পারছ না। লাবণ্য আমি কিচ্ছু জানি না। বিশ্বাস কর! লাবণ্য! লাবণ্য!

সে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিল।

চুলে আঠা আঠা। ইস চুলের ভিতর খুসকির বাসা বাঁধা। কেউ তাকে পরিষ্কার করে দেয় না। সে পড়ে আছে, মরে গেলে সবাই রক্ষা পেয়ে যায়।

সে ডাকল, লাবণ্য।

লাবণ্য, আমি ইন্দ্রদা। মনে নেই—নাংগলবন্দের বান্নি, কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা, তামার পয়সা, তিল-তুলসি, মনে পড়ছে তোমার! ইন্দ্রদাকে দু-আনা পয়সা দিতে। মনে করার চেষ্টা কর। মনে করবার চেষ্টা কর লাবণ্য। আমাদের কোনো পাপ নেই। না না, কোনো পাপ নেই।

তুমি আমি ছোটদাদুর শ্মশানে প্রদীপ জ্বেলেছি—পাপ আমাদের থাকতে পারে না। তুমি ভাল হয়ে ওঠ। তোমাকে আমি কত যে খুঁজেছি লাবণ্য! আমরা কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা বলেছি, আমাদের পাপ থাকতে পারে না। ইন্দ্র কানের কাছে

মুখ রেখে কথাগুলি বলে যাচ্ছে। মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

কাল আমরা যাব। আমার সঙ্গে যাবে। এখনতো আমার অপেক্ষা তৈরি হয়ে গেল। অপেক্ষার কী যে দরকার জীবনে লাবণ্য, তুমি বুঝবে না। কাল নয় পরশু আমরা যাবই।

এই লাবণ্য। লাবণ্য!

সে উঠে মুখের কাছে ঝুঁকে দাঁড়াল।

লাবণ্য শোন, কি শুনতে পাচ্ছ, আমিই ইন্দ্রদা, আমি তোমাকে স্টিমারঘাটে আনতে গেছিলাম—মনে পড়ছে! আমি তোমার পদ্ম মাসির ছেলে। মনে পড়ছে!

স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলে কাছারি বাড়ির মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে, মনে আছে! আমাকে দেখলে ছুটে আসতে মনে পড়ছে। লাবণ্য, সেই যে যাত্রা গান! তুমি বললে শরীর খারাপ—তোমাকে নিয়ে আমি বালির প্রান্তরে নেমে গেছিলাম। তুমি কিছুতেই বাড়ি যেতে চাইছিলে না। জ্যোৎস্নায় মাঠঘাট ভেসে গেছিল। তুমি আমাকে ডাকলে। প্যান্টে গিঁট লেগে গেছে। বলেছিলে নোখে খুলতে না পার দাঁত দিয়ে চেষ্টা কর।

তুমি কেন সব ভুলে গেলে লাবণ্য! আর তোমাকে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি না। কত উৎপীড়ন করতে পার দেখব। কতটা পার। আমি তো চাই তুমি উৎপীড়ন করবে, আমি সহ্য করব। আবার কোনো সকালে যখন টের পাব, তুমি জেগে গেছ, আমিও ভুল করতে পারি লাবণ্য। তবু আমাদের কোনো ইচ্ছের জগৎ তৈরি হয়ে গেছিল। দেশ ভাগ, দাঙ্গা না হলে আমরা এ-ভাবে ছিটকে পড়তাম না।

লাবণ্য!

লাবণ্য, আমি ইন্দ্রদা।

ইন্দ্র দেখল লাবণ্য পাশ ফিরে শুচ্ছে। সে যেন আর নিজের ভার বহণ করতে পারছে না। সে কি জেনে গেছে পাপ না থাকলে, কেউ এত ছোট বয়সে বাবাকে হারায়, না।

সে বলল, লাবণ্য তোমার অ্যালবামটার কথা মনে পড়ে! ওখানে তোমার আমার ছবি ছিল। মিলিয়ে নিও, বিশ্বাস না হলে মিলিয়ে নিও।

ইন্দ্র দেখল, লাবণ্য চোখ মেলে তাকাচ্ছে। কি যেন খুঁজছে। সে উঠে বসল। শাড়ি পরে গেছে গা থেকে। ইস পিঠে চাপ চাপ ময়লা। ব্লাউজ রিপু করা। সে কোথাও যেতে চায়। উঠতে পারছে না। সে তাকে তুলে ধরে বলল,

কোথায় যাবে! বল, নিয়ে যাচ্ছি। বাথরুমে যাবে! কী দাঁড়িয়ে থাকলে কেন!

লাবণ্য কেমন অসহায় গলায় বলল, আমাকে শুইয়ে দে হিরণ। আমি পারছি না।

লাবণ্য, আমি ইন্দ্র।

লাবণ্য বলল, কে?

আমি ইন্দ্র। ইন্দ্রদা!

সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকে দেখল। কিছু বলল না। কিছু বুঝল না। কেবল বলল, আমি যাব।

কোথায় যাবে?

আমি যাব। আর কোনো কথা না।

ইন্দ্র বলল, ঠিক আছে, চল। বলে জড়িয়ে ধরে দরজার বাইরে নিয়ে এল।

কোথায় যাবে?

আমি যাব।

করিডোর ধরে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকার করিডোর। ঘরের আলো করিডোরে পড়ায় আবছা মতো দেখা যাচ্ছে সামনের কিছুটা অংশ। দেয়ালে সুইচবোর্ড—করিডোরের আলো জ্বেলে নিয়ে সে দেখল কলাপসিবিল গেটে তালা মারা। আলো যে, প্রসন্নতার কথা বলে ইন্দ্র আগে জানত না। ইন্দ্র জড়িয়ে ধরেছে লাবণ্যকে। উষ্ণতার জন্ম হোক, জন্ম হোক সেই জ্যোৎস্নার নীল নক্ষত্র এবং কোনো আবাদের জমি পার হয়ে লাবণ্য আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসুক।

কোথায় যাবে? বল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

কতদূর যেতে চায়! সে বলল, এই বাথরুম। যাবে!

বাথরুমের পাশেই দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে লাবণ্য দাঁড়িয়ে থাকল। সে তাকে ছেড়ে দিচ্ছে না। যেন ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবে।

কাঁধে মাথা রাখ।

সে বাথরুমের দরজা খুলে বলল, যাও।

লাবণ্য গেল। বসে পড়ল। এবং ইন্দ্র তাড়াতাড়ি সায়া শাড়ি তুলে বসাল। কোন লজ্জা নেই, কোনো সংকোচ নেই—কেমন অনুভূতি-শূন্য হয়ে পড়েছে।

লাবণ্য বসে আছে।

ইন্দ্র জল ঢেলে দিল। তারপর জড়িয়ে বুকের কাছে তুলে বলল, চল।

সেই এক কথা।

আমি যাব।

কোথায় যেতে চায়! সে লাবণ্যকে নিয়ে পিছনের দিকের দরজায় এল। এখানটায় হুড়কো আঁটা। তালা দেওয়া নেই। সে হুড়কো খুলতেই মনে হল হিরণ জেগে গেছে। শীতলবাবুও। হিরণ দরজা খুলে অবাক, ইন্দ্রদা দিদিকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। হিরণ ছুটে গেল।

কী করছ, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ!

দেখি না কতদূর যেতে পারে। কেবল বলছে, আমি যাব।

ওতো রোজই বলে। যেখানে নিয়ে গিয়েই বসাও, এক কথা দিদির, আমি যাব।

দেখাই যাক্ না, বলে হিরণের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডাকল, লাবণ্য তুমি কোথায় যাবে। তুমি তো হাঁপাচ্ছ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তোমার!

সহসা দরজায় শীতলবাবুর ঠাণ্ডা গলা। তিনি বললেন, দেখছি আপনিও আর এক পাগল। এত রাতে দরজা খুলে লাবণ্যকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন! দরজা খোলা থাকলে চোর-ছ্যাচোর ঢুকে যেতে পারে।

ইন্দ্র বলল, দরজা বন্ধ করে দিন। সে শীতলবাবুর কথাও অগ্রাহ্য করতে চাইল। শীতলবাবু দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কিছুটা দাম্ভিক এবং এবং দুর্বিনীতও মনে হচ্ছে। চোখমুখ অপ্রসন্ন দেখাচ্ছে। নিজেকে সামলাতে না পেরে বলছে, এত দেখছি আর এক উৎপাত। হিরণকে ডেকে বলল, বাড়িটা আমার না তোমাদের ইন্দ্রদার! রাতে দরজা খুলে একজন উন্মাদরমণীকে নিয়ে তিনি হাওয়া খেতে যাচ্ছেন।

সহসা লাবণ্য চিৎকার করে উঠল, খবরদার, আমি উন্মাদ, ইতর ছোটলোক। বলেই হঠাৎ কেমন হিস্টিরিয়াগ্রস্থ হয়ে গেল। লোকটার মুখে থু থু ছিটিয়ে দিচ্ছে। নোংরা। আমি তোমাকে খুন করব। ঠিক খুন করব।

ইন্দ্র চিৎকার করে বলছে, লাবণ্য, লাবণ্য। তোমাকে মানায় না। তুমি কেন ছোট হবে। লাবণ্য, লাবণ্য—সে লাবণ্যকে ঝাঁকাতে থাকল।

যার হুঁস নেই, তার হুঁস ফিরিয়ে আনা খুবই কষ্টকর। এবং দেখছে লাবণ্যর গলার শিরা ফুলে উঠেছে। লাবণ্যর চোখ রক্তবর্ণ। লাবণ্য দুহাতে চেষ্টা করছে ইন্দ্রের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে।

হিরণ বলছে, ইন্দ্রদা ছাড়বে না। ছুটে গিয়ে পড়ে যাবে। অজ্ঞান হয়ে যাবে। ওকে ছেড় না।

আর তখনই দেখল লাবণ্য কেমন নিস্তেজ হয়ে গেল। বড় অস্বস্তি যেন

ভিতরে, তবু বলল, তোরা সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলতে চাস। আমি কী করেছি! কিছুতো করিনি। হিরণ তুই আমার ঝিনুকের নৌকা ফিরিয়ে দে। তুই আমার সব কেড়ে নিয়েছিস।

শীতলবাবু বললেন, হয়ে গেল। রাতে এখন নাটক চলবে। লোকজন বুঝবে আমার বাড়িটায় উন্মাদ রমণী ক্ষেপে গেছে। কী যে ঝামেলা!

ইন্দ্র বোঝাচ্ছে, লাবণ্য প্লিজ, তুমি চুপ কর। আমাকে ছোট কর না। তুমি যেখানে যেতে চাইবে নিয়ে যাব। কথা দিচ্ছি। লাবণ্য তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। ঠিক আছে, ঝিনুকের নৌকা হিরণ তোমাকে ফিরিয়ে দেবে। এই হিরণ, ওটা ওকে সকালে ফিরিয়ে দিবি।

হিরণ প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে আছে। রা করছে না মুখে কিছু। শীতলবাবু বলছে, নাও বল, ঝিনুকের নৌকা ফিরিয়ে দেবে। রা করছ না কেন! পাগলের কথার দাম দেয় কেউ!

ইন্দ্র বুঝল শীতলবাবু চটে গেছেন। ঝিনুকের নৌকা ফিরিয়ে দিতে বলে সে যেন সত্যি অপরাধ করেছে। এরা বুঝছে না কেন, প্রবোধ দেবার জন্য শুধু বলা। অবোধ বালিকার বায়না, খেয়াল—আপাতত বললে যদি শান্ত হয়। যেমন শান্ত করা হয় শিশুদের। কথাটা বলতে হিরণেরই বা এত দ্বিধা কেন! হিরণকেতো সে সত্যি বলেনি ফিরিয়ে দিতে। কবেকার স্মৃতি, কেউ মনে রাখে, না গোপন সিন্দুকে তুলে রাখে! তবু এই সামান্য উপহারটি দু-জনের মধ্যে রেষারেষির সৃষ্টি করেছে ভাবতেও খারাপ লাগছে। এ-সময় কেন জানি হিরণকেও তার স্বাভাবিক মনে হল না।

আরে বল না! দাঁড়িয়ে থাকলি কেন!

আমি না নিলে দেব কোত্থেকে!

চট করে ইন্দ্র মিছে কথা বলল, কেন, আমি তো দেখলাম তোর কাছে আছে।

আমার কাছে!

ইন্দ্র চোখ টিপল। কিন্তু হিরণ বুঝল না। সে বলল, মিছে কথা।

আমি ওটা নিয়ে নিয়েছি তোর কাছ থেকে। টের পাসনি। ইন্দ্র বেশ সপ্রতিভ গলায় বলল, লাবণ্য ওটা আমার কাছেই আছে। তোমাকে নিয়ে কলকাতায় যাই। তখন ফিরিয়ে দেব। ঘরে চল।

লাবণ্য তার দিকে যেন এবার ভাল করে তাকাল—কে লোকটা এমন বিস্ময় চোখে মুখে। অপরিচিত একজন পুরুষ তাকে জড়িয়ে রয়েছে এমনও ভাবতে পারে। সে এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে ছুটতে থাকল। ইন্দ্রও পিছু নিল।

কিছুটা গিয়েই পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। শীতলবাবু ছুটে আসছেন। হিরণও। ঘাটলার কাছে ঘাসের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে প্রতিমা বিসর্জনের মতো।

ইন্দ্র পাঁজাকোলে তুলে নিল লাবণ্যকে। কাকে যে বলল, শেষপর্যন্ত এই তোমার প্রমিস! প্রমিস তোমার এখানে এসে ঠেকেছে!

॥ দশ ॥

সকালেই কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা অমল এসে হাজির। দাদা আপনি! কী ব্যাপার! এখানে আপনি। আরও কথা বলত হয়তো, কিন্তু ইন্দ্র কথা বলতে চায় না, কথা বলতে তার ভাল লাগছে না। সে শুধু বলল, ভাই তুমি একটা উপকার করতে পার! গাড়ির ব্যবস্থা করতে পার। আমার আত্মীয়া অসুস্থ। তাকে কলকাতায় নিয়ে যাব। খরচের জন্য ভাববে না। ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে মনে হয়।

এবং এই করে ইন্দ্র গাড়ি ঠিক করে ফেলল। সে গাড়িতে শহরে গেল। কিছু শাড়ি সায়া ব্লাউজ কিনল। টাকা ধার করল অমলের কাছ থেকে। কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেবে। লাবণ্যকে এখান থেকে তুলে নেবার সময় বিড়ম্বনার সৃষ্টি হতে পারে—কারণ যাবার সময় সে কী করে বসতে পারে, ইন্দ্র ঠিক বুঝতে পারছে না। অমল কাছে থাকলে সুবিধা, স্থানীয় মানুষের সাহায্য পাওয়া যাবে। এ কারণেই অমলকে থেকে যেতে বলল। এখন ইন্দ্র এই বাড়িতে যেন অতিথি না, আগন্তুক। হিরণের চিঠি, খুব বিপদ, এবং আসার পর লাবণ্যকে এ-ভাবে আবিষ্কার—মাথা সে ঠিক রাখতে পারছে না।

ইন্দ্র হিরণকে ডেকে বলল, ওর কি আছে দে।

কি আবার থাকবে!

কিচ্ছু নেই! শাড়ি সায়া ব্লাউজ!

না ইন্দ্রদা। ওতো আমাদের এখানে এসে উঠেছে এক জামা-কাপড়ে।

এখানে! কী বলছিস, এক জামাকাপড়ে, মানে।

মানে দিদির বিয়ের মাসও পার হয়নি। উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় হাজির।

কোথায় বিয়ে হয়েছিল! ওর স্বামী কোথায়! তাঁকে আমার খুব দরকার।

তিনি বিয়ে-থা করেছেন। খোঁজ-খবর নেন না। দিদিরই দোষ। যা একরোখা স্বভাবের। ভদ্রলোককে দোষ দিতে যাব কেন। সে পরের ছেলে।

ইন্দ্র যেন এমন কিছু করছে, যার আইনগত কিছু বেসামাল দিকও আছে। তবু মানুষের কোনো এক শুভবোধ নিরন্তর তাড়না করলে, সব বাধাই তুচ্ছ মনে হয়।

কোথায় আছেন লাবণ্যর বর!

হাফলং-এ ছিল। তারপর বদরপুরে বদলি হয়ে গেছেন। রেলে কাজ করেন। বছর পাঁচেক কোনো খোঁজ নেই।

ইন্দ্র অবাক, লাবণ্যর হাতে শাঁখা নেই। এয়োতির কোনো চিহ্ন নেই। তবে লাবণ্যর স্বামী আছেন। কিংবা লাবণ্য এখানে এসেই বা কী আচরণের সম্মুখীন হয়েছে সে জানে না। যেন সে বুঝতে পারছে, লাবণ্যর হাত থেকে হিরণও নিষ্কৃতি চায়। লাবণ্যর প্রতি তার দুর্বলতা আছে, এই দুর্বলতাই তাকে টেনে আনবে হিরণ বোধহয় এও টের পেয়েছিল। তাছাড়া সে বিয়ে থা করেনি, মেসে থাকে, সব খবরই হয়তো হিরণের জানা।

সে আর কিছু বলেনি। কিন্তু বিয়ের একমাসের মধ্যে লাবণ্য ফিরে আসে। হিরণের কি আগে বিয়ে থা হয়ে যায়! যদি হয়, কেন! কিংবা লাবণ্য কি সত্যি ঝিনুকের নৌকা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। তার অপেক্ষা করছিল—কিংবা চাপের কাছে লাবণ্য মাথা নুইয়েছে। এমন দুরবস্থার মধ্যে তাকে ফেলে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, সে রাজি না হয়ে পারেনি।

বড় দুর্যোগ—দুর্যোগই মনে হল। ঝড়ে এখন উপড়ে পড়েছে গাছটা। সে তারপরই গাড়ি নিয়ে গেছিল—দোকান থেকে পছন্দমতো দামি শাড়ি সায়া ব্লাউজ এমন কি সাবান স্নো-পাউডার লেদার অ্যাটাচি কিনে ফিরে এসেছে। হিরণকে ডেকে বলেছে, ওর শাড়ি সায়া পাল্টে দাও। এ-ভাবে তো নিয়ে যাওয়া যায় না।

কিন্তু লাবণ্য রাজি না। সে শুয়ে আছে, তাকে তোলা যাচ্ছে না। ইন্দ্র মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, লাবণ্য, আমরা যাব।

এই যাব কথাটা কোথায় যেন এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা মনে হয়—লাবণ্যর মধ্যে ক্ষণিকের জন্য আলো জ্বেলে দেয়। সে উঠে বসল। উঠতে পারছে না। তবু সে চেষ্টা করলে ইন্দ্র নিজে তাকে বসিয়ে দিল। তারপর যে কি হয়ে যায়—সে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে লাবণ্যর সায়া, শাড়ি খুলে সব পরিয়ে দিতে গিয়ে টের পেল, সারা শরীরে অজস্র ক্ষতচিহ্ন। লাবণ্যর উপর যেই হোক অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। সারা শরীরে সেই চাক চাক ময়লা, নাভিমূলে গভীর অন্ধকার। সে লাবণ্যর জানুতে মুখ প্রবিষ্ট করে বলল, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি লাবণ্য। তুমি ভাল হয়ে যাও।

গাড়িতে উঠে বসা না পর্যন্ত তার আতঙ্ক, লাবণ্য যা খুশি করতে পারে! ইন্দ্র টেনসানে ভুগছে। একদিনেই চোখ বসে গেছে—সে সারারাত ঘুমায়নি।

তার জন্য কোনো ওষুধই আর প্রয়োগ করা হয় না। শুধু কিছু কড়া ঘুমের ওষুধ ছাড়া। যাবার আগে মনে হল, শেষবারের মতো সে ওষুধটি প্রয়োগ করবে। কারণ— লাবণ্য রাস্তায় জোরজার করতে পারে— গাড়ি থেকে নেমে যাবে বলতে পারে— এমন সব হাজার আশঙ্কায় ইন্দ্র আতঙ্কিত হয়ে আছে।

অমল ইন্দ্রদার ব্যাপার-স্যাপারে কিছুটা বিস্মিত। কে হয় ইন্দ্রদার? সত্যি তো উন্মাদ। চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায়। কলকাতায় ভাল চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু এমন কি আত্মীয়তা যা তাকে এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছে! সে বলেছিল, কে হয় আপনার!

সেই এক উত্তর।

কে যে হয় জানি না। দেখি জানতে পারি কি না, দেখি চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই!

অমল বলল, চলুন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

না না। তোমায় কষ্ট করতে হবে না। পারলে একাই পারব। তোমার দরকার হবে না। অনেক উপকার করেছ। তুমি না থাকলে এত সহজে নিয়ে যেতে পারতাম না।

ইন্দ্র গাড়ির পেছনটায় দুটো বালিশ রাখল। একটা হাতপাখা নিল। জলের ব্যবস্থাও রাখল। কুজোয় ঠাণ্ডা জল, খাবার প্যাকেট। সব গোছগাছ করে সে লাবণ্যর ঘরে ঢুকে বলল, চল তুমি যাবে বলেছিলে।

হিরণ কাঁদছে। কেন কাঁদছে ইন্দ্র বুঝতে পারছে না। হয়তো কৈশোরের এক জলছবি ভেসে উঠেছে—দিদির সেই আবৃত্তি, গান, দিদির সেই স্বাভাবিক জীবনের কথা মনে পড়ছে তার—কিন্তু নিয়তি মানুষকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে তাড়া করে—এমন সব ভেবেই হয় তো চোখের জল ফেলছে। নিষ্কৃতি সহজে যে পাওয়া যায় না হিরণের চোখে জল দেখে টের পেল ইন্দ্র।

সে বলল, চিন্তা করিস না। গিয়েই খবর দেব। ওর প্রেসক্রিপসানগুলো কোথায় যে রাখলাম। সে পকেট হাতড়াচ্ছে। অ্যাটাচি খুলছে—এই তো এখানে। ভুলে টেবিলের উপর রেখে দিয়েছিল। হিরণ টেবিল থেকে প্রেসক্রিপসানগুলো তুলে তার হাতে দিল।

সব দরকার। কিন্তু বুঝল না, হিরণ তো তার নিজের সায়া শাড়ি দিতে পারত। দু-পাঁচটা দিলে ওর কী ক্ষতি হত। খুব অসুবিধা হবারও কথা নয়। অথচ কেন যে বলল, ওতো এক জামা-কাপড়ে এসে উঠেছিল।

সংকীর্ণতা কিংবা কৃপণ স্বভাবের মনে হওয়া স্বাভাবিক। হিরণ তার দিদির

জন্য সামান্য শাড়ি সায়ার আত্মত্যাগে কুণ্ঠিত। কেন! কোনো বড় অশান্তি হতে পারে—অথবা শীতলবাবু ছুটি নিয়ে বসে আছেন, সতর্ক নজর রাখার জন্য। দিলে তো নষ্ট করে! কি হবে সায়া শাড়ি দিয়ে! পয়সা কি মাগনা! কথা শোনাতে পারে। আর সংসারে অশান্তির ভয়েও হিরণ বলতে পারে। ওর তো এখানে কিছু পড়ে নেই! পরিত্যক্ত সায়া শাড়ি ছাড়া লাবণ্যর ভাগ্যে বেশি কিছু জুটত বলে মনে হয় না।

হিরণের উপর অযথা রাগ করেও লাভ নেই। সে লাবণ্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

লাবণ্য বলছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ!

ইন্দ্রর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বিন্দুমাত্র সংশয়ে পড়ে গেলেই জ্বলে উঠবে। সে বলল, তুমি যে যেতে চাও। তুমি যে বল, আমি যাব! তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি খুশি মতো ঘুরতে পারবে। তোমার দরজা জানালা খোলা থাকবে।

কে খুলে দেবে?

কেন, আমি খুলে দেব! আমি। হাঁট! দাঁড়ালে কেন! গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, এস বসি। মাথা নুইয়ে দাও। আর একটু পা তুলে বস। ওদিকটায় সরে বস। সে লাবণ্যর মাথার কাছে বালিশ দিয়ে বলল, মাথা রাখ, আরাম পাবে। তারপর দরজা লক করে, অমলকে বলল, আমি লাবণ্যর সঙ্গে যাচ্ছি। সে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব। তাই না লাবণ্য! আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আমরা তো কলকাতায় যাচ্ছি, তাই না লাবণ্য।

লাবণ্য সাড়া দিচ্ছে না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে।